সাহিত্যিকা সম্বন্ধে

'সাহিত্যিকা' বাংলা সাহিত্যের সম্পদ স্বরূপ হইয়াছে। প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া তরুণ লেখকের সমালোচনায় অসাধারণ শক্তির, চিন্তাশীলতার ও জ্ঞানের প্রচুর পরিচয় পাই। Literary criticisms-এ এমন হাত বাংলায় আজকাল অল্প সমালোচকেরই আছে। Critical study কাহাকে বলে, এ গ্রন্থপাঠে সকলে তাহার পরিচয় পাইবেন। খুব গুরুতর বিষয়ও লেখক যুক্তি-তর্কে এমন সবলভাবে সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন, বিশ্ব-সাহিত্যের স্বরূপ ও বর্ত্তমান সাহিত্যের গতিভঙ্গী এমন পরিষ্কার সকলের সম্মুখে ধরিয়াছেন যে, এ গ্রন্থ বারবার পড়িয়াও পড়ার সাধ মেটে না।

—ভারতী ১৩২৮

সাহিত্যের প্রকৃতি বুঝাইবার যে নূতন পন্থা তিনি দেখাইয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে নিতান্তই অপূর্ব্ব জিনিষ। নলিনীবাবুর চিন্তার গভীরতা ও অসাধারণ বিশ্লেষণ শক্তি দেখিয়া, আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

— মানসী ও মর্ম্মবাণী ১৩২৮

সাহিত্যিকা

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত

১৩৫৭

আর্য্য পাবলিশিং হাউস,
৬৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; পরিবর্ত্তন করিতে গেলে অনেক পরিবর্ত্তন করিবার লোভ হয় বলিয়া যেমন ছিল প্রায় তেমনই রাখিয়া দিয়াছি। এক সময়ে এক ভাবের প্রেরণায় এক লেখা হইয়া থাকে, পরে শোধরাইতে গেলে সে ভাবের পরিবর্ত্তে আর একটি ভাব লইয়া অথবা কোন ভাব না থাকিলে শুধু কাঠামোকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়, ইহাতে লেখাটির সংশোধন অপেক্ষা নির্যাতনই বেশী হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং এ কাজ হইতে বিরত হইয়াছি। কোন লেখক যে নিজের লেখায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইতে পারেন, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না, তাই পুরাতন লেখাকে বারবার মাজাঘষার চেয়ে নূতন কিছু লিখিয়া যাওয়াই আমি ভাল বোধ করি। পুরাতন লেখার যদি জীবন কিছু থাকে তবে সে জীবন তার গুণ লইয়াও বটে, আবার দোষ লইয়াও বটে।

সব প্রবন্ধগুলির মধ্য দিয়া মিলন সূত্রের কাজ করিতেছে যে বিশেষ উপলব্ধি বা দৃষ্টিভঙ্গী সেটি ব্যাখ্যা করিতে গেলে আর একটি প্রবন্ধ লিখিতে হয়, কাজেই সে কাজেও হস্তক্ষেপ করিলাম না। ইতি—

লেখক

বিষয় সূচী

মৃতং কঞ্চন বোধয়ন্তী

কবিত্বের ত্রিধারা

ইউরোপীয় প্রতিভার তিনটি ধারা। তিনটি জাতি বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাবে যে দীক্ষা দিয়াছে তাহারই প্রভাবে ইউরোপের শিক্ষা সভ্যতা, তাহার সকল শিল্পসৃষ্টি গড়িয়া উঠিয়াছে, অনুরঞ্জিত হইয়াছে। ইউরোপের কবিপ্রতিভাও চলিয়াছে এই তিনটি ধারায়, গঠিত হইয়াছে এই তিনটি ভঙ্গিমায়। প্রথম দীক্ষা আসিয়াছে গ্রীস হইতে। শান্ত স্বচ্ছ মতি, পরিশুদ্ধ বিচারবুদ্ধি, সরস চিন্তানৈপুণ্য—sweet reasonableness—ইহাই গ্রীক প্রতিভা। ইউরোপের দ্বিতীয় দীক্ষা রোমের নিকটে। রোম দিয়াছে স্থূল বস্তুর উপর সুদৃঢ় আধিপত্য—সংযম, শক্তি, পুরুষত্ব, তেজঘন মহত্ত্ব। আর এই দুইটির পশ্চাতে রহিয়াছে একটা অতীত যুগের দীক্ষা, একটা প্রাচীনতর প্রতিভা, যাহার মধ্যে ইউরোপ সন্ধান পাইয়াছে এসিয়ার অন্তরাত্মা, যাহা পাশ্চাত্যকে মিলাইয়া ধরিয়াছে প্রাচ্যের সহিত—এটি হইতেছে কেল্‌টিক প্রতিভা। কেল্‌টিক প্রতিভা চাহিয়াছে, যাহা মানুষের বিচারবুদ্ধি সম্যক ধারণা করিতে পারে না, তপঃশক্তির তীব্র পীড়নের মধ্যেও যাহা ধরা দিতে চায় না, এমনি একটা মুক্ত অসীম অমূর্ত্তের আভাস, একটা ইন্দ্রিয়াতীত প্রতিষ্ঠানের রহস্যময় লাঞ্ছনা। কেল্‌টিক, রোমক ও গ্রীক—এই তিনটি দীক্ষা লইয়া ইউরোপ। ইউরোপের কাব্যজগতেও খেলিয়াছে এই তিন প্রকার সুর।

কিন্তু শুধু ইউরোপের মধ্যে আবদ্ধ না রাখিয়া, বিশেষ কোন জাতির সহিত সংযুক্ত না করিয়া, এই তিনটি নামকে আমরা কবিত্বের তিনটি সাধারণ আদর্শের প্রতীকস্বরূপ লইতে পারি। বস্তুত সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে

কাব্যজগতে আমরা দেখিতে পাই এই তিন প্রকার আদর্শের, এই তিন প্রকার ভঙ্গিমার উদাহরণ। ভাষা ও ভাবের লীলাভিরাম প্রাঞ্জলতা, অর্থের স্ফুট অভিব্যঞ্জনা; কল্পনা আছে কিন্তু সে কল্পনা বিচারবুদ্ধিরই সুনিপুণ সম্প্রসারণ—তাহার উপর অশরীরী অতীন্দ্রিয় প্রহেলিকার ছায়া কিছু পড়ে নাই, তাহা অতিমাত্র মানুষেরই। বস্তুকে স্পষ্ট করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ প্রকট করিয়া, সুভঙ্গিম চারুতায় ভরিয়া মানসনয়নের সম্মুখে গোচর করিয়া ধরা, কাব্যের ইহাই গ্রীক আদর্শ—ঠিক যেন স্থির নির্ম্মল জলের উপর প্রতিবিম্বিত তীরবর্ত্তী বনস্থলীর একখানি ছবি। কাব্যের রোমক আদর্শ হইতেছে কবিতাকে মন্ত্রস্বরূপ করিয়া তোলা—সেখানে বাহুল্য কিছু নাই, নিরর্থক কিছু নাই, সবই সংক্ষিপ্ত, দৃঢ়বদ্ধ, গুরু, গাঢ়, ওজঃপূর্ণ, তপঃশক্তিতে ভরাট। দেখিয়া মনে হয় যেন প্রখর সূর্য্যকিরণ-দীপ্ত নিথর প্রস্তর-প্রতিমা। আর কেল্‌টিক আদর্শ হইতেছে বাক্য অর্থ ছাড়াইয়া, কল্পনার আবরণকেও ভেদ করিয়া একটা তুরীয়ের বার্ত্তা, অনন্তের প্রহেলিকা, অনির্দ্দেশ্যের অপার লক্ষণাকে ফুটাইয়া তোলা—বস্তুর রূপের সহায়ে বস্তুর রূপের অন্তরালে শুধু নিবিড় ভাবগম্য একটা যে অরূপের, অবাঙ্‌মনসগোচর সত্তা ছাইয়া আছে তাহার কিছু ইঙ্গিত দেওয়া।

কেল্‌টিকের এই অরূপ ভাবগর্ভ কবিত্বের উদাহরণ কীট্‌সের

Magic casement opening on the foam
Of perilous seas in fairy-lands forlorn—

এখানে আমরা বোধ করি যেন এই স্থূল অতিস্পষ্ট, এই সসীম খণ্ডিত জগৎকে ছাড়াইয়া কোথায় কোন্ অদৃশ্য, কোন্ অতিসূক্ষ্ম জগতের অতলতায় ডুবিয়া যাইতেছি, সৃষ্টির অন্তরালে লুক্কায়িত কি এক অনন্ত ইঙ্গিতে ভরপুর রহস্যটি উঁকি দিয়া দেখা দিতেছে। মানুষ অন্তরাত্মা দিয়া সে বস্তুটিকে ধরিতে পারে কিন্তু বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে পারে না, যাহার

একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না অথচ যাহা ব্যাখ্যার অপেক্ষাও রাখে না, অতি-জগতের চেতনা লইয়া যাহা স্বপ্রকাশ। অথবা যখন শুনি শেক্সপীয়র বলিতেছেন

Daffodils
That come before the swallow dares and take
The winds of march with beauty—

তখন কথাগুলি আমাদের বুঝিবার বৃত্তি বা কল্পনাশক্তিকে স্পর্শ না করিয়াই একেবারে অন্তরের কি এক নিভৃত তন্ত্রীতে যাইয়া আঘাত করে, নাচাইয়া তোলে আর-এক জগতের মোহন মূর্চ্ছনা—সে যেন দিব্য অপরোক্ষানুভূতি, যাহা বস্তুর কি যেন অশরীরী দিব্যভাব খুলিয়া ধরিতেছে। গ্রীকের সে প্রসাদগুণ, সে স্বচ্ছ সুস্পষ্ট প্রতীতি, নিপুণ-কারিগর-সুলভ যথাযথ বস্তুবিন্যাস, প্রত্যক্ষের স্ফুট ব্যঞ্জনা—তাহার উদাহরণ ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের

Fair as a star, when only one
Is shining in the sky.

অথবা ম্যাথ্যু আর্ণল্ডের

The day in his hotness,
The strife with the palm ;
The night in her silence,
The stars in their calm.

কেল্‌টিক প্রতিভার সে অনির্ব্বচনীয় ইন্দ্রজাল এখানে নাই। বস্তুর অন্তরের, সত্যের যে বিপুল প্রহেলিকা, যে অচিন্ত্য অপ্রকাশ দিব্য চেতনা, তাহার আভাস কিছু দিবার চেষ্টা এখানে হয় নাই—সহজ বোধের মধ্যে একটা সরল সৌন্দর্য্য লইয়া সত্য গোচর প্রকট হইয়াছে, নিঃশেষে আপনাকে ধরা দিতেছে। আর কবিত্বের তাপসশক্তি, ব্রহ্মবাণীর অনন্ত

তেজ, রোমকের বজ্রসার স্থৈর্য্য দেখাইতেছে মিল্‌টনের

Fall'n Cherub! to be weak is miserable—

অথবা দান্তের

Lasciate ogni speranza voi ch'entrate.[১]

ইউরোপীয় কাব্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া ভারতীয় কাব্য যদি লই, তবে সেখানেও কবিত্বের এই তিনটি ভঙ্গিমার উদাহরণ আমরা পাই। বৈদিক কবি কুৎস যখন গাহিতেছেন

পরায়তীনামন্বেতি পাথ আয়তীনাং প্রথমা শশ্বতীনাম্।
ব্যুচ্ছন্তী জীবমুদীরয়ন্তী উষা মৃতং কঞ্চন বোধয়ন্তী ॥[২]

তখন তিনি কিনা একটা নিভৃত সত্যের মুখ হইতে আবরণটি খুলিয়া দিতেছেন—বিশ্বের সমস্ত রহস্য, সমস্ত প্রহেলিকা অনন্তের প্রসারে যেন তরঙ্গায়িত হইয়া যাইতেছে। মৃতং কঞ্চন বোধয়ন্তী—বাস্তবিকই ত আমাদের চেতনার মাঝে কি অজানা অচেনা অপার্থিব কিছু জাগিয়া উঠিতেছে, তাহা বুঝিতেছি, কিন্তু তাহার রূপ একটা নির্ণয় করিয়া দিতে পারি না, দেওয়ার প্রয়োজনও কিছু নাই। অর্থগৌরবে এ বাক্যটি ভরপুর, কিন্তু এই অর্থের মধ্যেই উহা শেষ হইয়া যায় নাই; অর্থকে ছাড়াইয়া একটা অশরীরী ভাব, অনির্দ্দেশ্যের দ্যোতনা সেখানে ভাসিয়া উঠিয়াছে এবং অর্থ অপেক্ষা বিশেষরূপে এই জিনিষটিতেই রহিয়াছে কবিতাটির প্রাণ। আর উহারই নাম আমরা দিয়াছি কেল্‌টিকের সম্মোহিনী বিদ্যা, দিব্যভাব। তারপর বাল্মীকির

[১] দূরে ফেল আশা যত কে তুমি পশিছ হেথা।

[২] পরপারে চলিয়া যাইতেছে যাহারা তাহাদেরই পথখানি যে অনুসরণ করিতেছে, অনন্তশ্রেণীভরে আসিতেছে যাহারা তাহাদের যে সর্ব্বপ্রথম, এই সে উষা আপনাকে উদার প্রসারিত করিয়া দিতেছে, প্রাণবন্ত যাহা তাহাকে সে বাহিরে আনিয়া ধরিতেছে, মৃত কি যেন আবার কাহাকে সবুদ্ধ করিতেছে।

তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্য্যং শস্যং বা সলিলং বিনা।
ন তু রামং বিনা দেহে তিষ্ঠেৎ তু মম জীবিতম্ ॥

এখানে পাই গ্রীকের স্নিগ্ধ মনীষা। কেল্‌টিকের সে যাদু এখানে নাই, ইহার সবই স্পষ্ট যথাযথ অর্থগৌরবে পরিপূর্ণ, একটা সুবিমল স্বচ্ছতার ভিতর দিয়া উহার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে—অর্থকে রহস্যময়ী কুহেলিকার মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। আর কবিতাকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ করিয়া তুলিয়াছেন মহাভারতকার

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ কিং শেষে ভীমসেন যথা মৃতঃ

—এ কথাটির বর্ণে বর্ণে দৃপ্ত তেজ ছুটিয়া বাহির হইতেছে, যতির কৃচ্ছ্র সাধনার কি একটা নিথরতা উহার পর্ব্বে পর্ব্বে—মন্ত্রেরই মত উহা নিরেট, মন্ত্রেরই মত অব্যর্থ শক্তিতে ভরপুর।

কবিপ্রতিভার এই তিনটি ভঙ্গিমাকে আমরা তিন রকম বিভিন্ন আদর্শ রূপেই দেখাইয়াছি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উহারা তেমন সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক বস্তু নহে। বস্তুত সকল কবিতার মধ্যেই এই তিনটি ধারা থাকা প্রয়োজন, এই ত্রয়ীর সমবায়েই কবিত্বের পূর্ণতম শ্রেষ্ঠতম বিকাশ। প্রথমে চাই একটা অনন্তের অভিব্যঞ্জনা, বিরাটের লক্ষণা, অনির্দ্দেশ্যের ইঙ্গিত। কারণ সকল শিল্পই হইতেছে সত্যকে সুন্দরকে রসবৎকে ফুটাইয়া তোলা। আর এই যে সত্য সুন্দর রসবৎ তাহার মূল, তাহার প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে সৃষ্টির পরার্দ্ধে, অনন্তের অসীমের মধ্যে। এই অনন্ত অসীম, এই তুরীয়ের ভিতর হইতেই শিল্পী তাঁহার শিল্পবস্তুকে কাটিয়া তুলিতেছেন। যে নিগূঢ় ভাব বস্তুর প্রকটলীলার অন্তরালে, কোন বিশেষ রূপের মধ্যে যাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না, বৃহতের প্রসারে যাহা লীলায়িত—সেই অজ্ঞাত অরূপ অনন্তের ইঙ্গিত ব্যতিরেকে বস্তুটির যতটুকু পাই তাহা অতিমাত্র স্থূল খণ্ডিত অচল; তাহা জড়বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে, কবি কিন্তু তাহাকে কখনই একান্ত করিয়া

লইতে পারেন না। দ্বিতীয়ত, এই যে অনন্ত তাহা আবার শুধু অশরীরী অনন্তই নয়, তাহা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে একটা বিশেষ বিগ্রহ। এই অনন্তের মধ্যেই একটা বিশেষ ভাব, বিশেষ রস জমিয়া উঠিয়াছে একটা বিশেষ অর্থের সংস্পর্শে। অর্থের চিন্তার রেখাপাতেই কুহেলিকাময় ভাবুকতা মানসপটে গোচর হইয়া দেখা দিয়াছে, স্ফুট বদ্ধ বহুভঙ্গিমরুচির হইয়া চলিয়াছে। অরূপ যখন রূপের প্রতি লেখায় সুবলয়িত হইয়া উঠিতেছে, সীমার টানে টানে যখন অসীম আসিয়া ধরা দিতেছে, তখনই না আনন্দের খেলা? কেল্‌টিক প্রতিভা হইতেছে বস্তুর যে নিগূঢ় প্রহেলিকা, বস্তুর অন্তরাত্মায় মিশিয়া রহিয়াছে যে অনন্তের ছায়া; আর গ্রীক প্রতিভা হইতেছে বস্তুর যে আনন্দ, রূপের মাঝে প্রকাশের মাঝে যে রসলাস্য। কিন্তু এই দুইটিকে লইয়া কবিপ্রতিভা সম্পূর্ণ নহে। কবিত্ব হইতেছে আবার শক্তির পরিস্ফুরণ, সৃজনের মধ্যে রহিয়াছে যে বীর্য্যের অনুপ্রেরণা। বস্তুর এই শক্তির দিকটি দেখাইতেছে লাতিন প্রতিভা। লাতিনে বাক্যের গ্রন্থীতে গ্রন্থীতে যে একটা ওজঃ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে, ভাব যে সেখানে নিবিড়, অর্থ অব্যর্থ শৃঙ্খলায় সম্বদ্ধ, তাহাতে আমরা অনুভব করি সত্যের গীর্ব্বাণীর তপঃশক্তি। ফলত, সকল প্রকার সৃজনের জন্য চাই যুগপৎ এই তিনটি জিনিষ—১. দৃষ্টি, ২. মনীষা, ৩. প্রাণশক্তি বা তপস্। দৃষ্টিতে পাই বস্তুর আত্মা, তাহার ভাগবত সত্তা; মনীষা দেয় বস্তুর অন্তঃকরণ, তাহার প্রকট মনোভাবরাজী; আর, তপঃশক্তি বস্তুকে শরীরী করিয়াছে, যথাবিন্যস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ভরিয়া জাগ্রত জীবন্ত বীর্য্যবান্ করিয়া ধরিয়াছে।

আমরা উপরে যে-সকল উদাহরণ দিয়াছি তাহা হইতেই আমাদের এই বক্তব্যটি স্পষ্ট বুঝা যাইবে। তাহাদের যে-কোন একটি লইয়া যদি একটু অনুধাবন করি তবে দেখিব উহার মধ্যে এই তিনটি ধারাই রহিয়াছে। তবে তিনটিই যে সমানভাবে স্ফুট তাহা নয়—একটিই

হইতেছে মুখ্য সুর আর সেই অনুসারেই শ্রেণীবিভাগ করিতে পারিয়াছি; তবুও আর দুইটিও তাহার পশ্চাতেই রহিয়াছে। আমরা বলিয়াছি

তিষ্ঠেল্লোকো বিনা সূর্য্যং শস্যং বা সলিলং বিনা

অথবা

The night in her silence,
The stars in their calm

হইতেছে গ্রীকসুলভ প্রসাদগুণাত্মক কবিতা। সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গেই এখানে, এই সুব্যক্ত সুবোধ্য অর্থদ্যোতনারই পশ্চাতে একটা অতীন্দ্রিয়লোকের বিপুলতা, একটা অনন্তচেতনার রহস্য কি প্রসারিত হইয়া চলে নাই? শুধু তাহাই নয়, কণ্ঠে উচ্চারণ করিতে করিতে উহাদের মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে মন্ত্রশক্তিরই ওজস্ আমরা কি অনুভব করি না? আর বৈদিক ঋষির

পরায়তীনামন্বেতি পাথ

কেল্‌টিক বা দিব্যভাবের সেই আদর্শ কবিত্ব, উহা ত অর্থে অর্থে সুষীম—আর উহা যে অনির্ব্বচনীয় অমোঘ মন্ত্র তাহাও কি আবার বলিবার প্রয়োজন আছে?

২

মনীষার যে প্রসাদগুণের যে নির্ম্মলতার যে দক্ষতার আদর্শস্বরূপ ছিল প্রাচীন গ্রীক, আধুনিক জাতি-সকলের মধ্যে ফরাসী যেমন তাহা আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছে এমন আর-কেহ পারে নাই। ফরাসীর মানস-প্রকৃতি যেমন লঘুপ্রকাশক তেমনি তাহা অতুলনীয়। এই ফরাসী ভাষা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—le vêtement le plus transparent de la pensée, চিন্তাকে পরাইবার এমন স্বচ্ছ পরিধান আর-কোন ভাষায় মিলে না। ব্যাখ্যার জন্য, বিবৃতির জন্য, বুঝিবার-

বুঝাইবার জন্য এটি একেবারে আদর্শ ভাষা। এখানে হেঁয়ালি অস্পষ্টতা দ্ব্যর্থতার স্থান নাই—নাই এখানে জটিল গ্রন্থি, নাই ব্যাসকূট। কিন্তু ঠিক এইজন্যই ফরাসীর গদ্য যেমন অপরূপ পদার্থ, তাহার কাব্য সেই অনুপাতে মহনীয় হইয়া উঠিতে পারে নাই। চিন্তার বুদ্ধির বিচারের সহজ অনুভূতির মধ্যে সব জিনিষ ফেলিয়া সরল সুস্পষ্ট মনোজ্ঞ করিয়া তোলা হইয়াছে বটে, কিন্তু আত্মার যে রহস্য, অজ্ঞাতের অসীমের মধ্যে যে বিরাট বস্তুরিক্ত ভাবঘন দ্যোতনা—তাহার সন্ধান সেখানে তেমন পাওয়া যায় না। আর এইখানেই গ্রীক হইতে ফরাসীর পার্থক্য। গ্রীকের মনীষা একদিকে যেমন বস্তুতন্ত্র ছিল, প্রত্যক্ষকে রেখায় রেখায় ফুটাইয়া ধরাতেই যাহার বিশেষত্ব, অন্যদিকে তেমনি তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল আর-একটি লোকের দীপ্তি। আর-এক প্রকার অনুভূতির ছায়াসম্পাতের জন্য তাহার মধ্যে যথেষ্ট অবকাশই ছিল। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে গ্রীক তাহার প্রাণের দীক্ষা পায় মিশর হইতে—মিশরের—প্রাচ্যের যে অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম সম্পদ, তাহারই একটা ছায়া বুঝি সে কিঞ্চিৎ ধরিতে পারিয়াছিল। সে যাহা হউক, আমাদের সংজ্ঞা অনুসারে বলিতে গেলে বলিব, ফরাসী গ্রীক-প্রতিভা পাইয়াছে, কিন্তু গ্রীকেরও অন্তরালে ছিল যে একটি কেল্‌টিক-প্রতিভা সেটিকে সে গ্রহণ করিতে পারে নাই। ফরাসীর মধ্যে নাই কেল্‌টিকসুলভ সেই তুরীয় প্রহেলিকাবোধ, যেটি হইতেছে কবিত্বের মূল প্রতিষ্ঠা। তাই ফরাসী কাব্যে পাই না কবিত্বের সে অতলস্পর্শতা, না সে অনন্তের ইন্দ্রজাল। সবই সেখানে অতিমাত্র ব্যক্ত, সহজেই শেষ হইয়া যায়, একটুতেই ফুরাইয়া যায়; তাই বুঝি সেন্ত্‌-বাভ্‌ (Sainte-Beuve) বলিয়াছেন, Our French poets are too soon read—আমাদের ফরাসী কবিদিগকে বড় অল্পেতেই বুঝিয়া ফেলা যায়।

ফরাসী-সাহিত্যে ভিক্তর হিউগোর বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব এইখানে যে তিনি ফরাসীর এই অভাবটিই কথঞ্চিৎ পূরণ করিতে চাহিয়াছিলেন; তিনি ফরাসী-সাহিত্যে দিতে চাহিয়াছিলেন একটা বিরাটের বোধ, প্রহেলিকার ইঙ্গিত, একটা অতল অন্তর্মুখীনতা। হিউগোর অখ্যাতি তাঁহার বাগাড়ম্বরের জন্য, সুখ্যাতি তাঁহার অদ্ভুত শব্দসম্পদ—বাক্যের সহায়ে জলন্ত চিত্রাঙ্কনের জন্য। কিন্তু এ-সকলের মধ্য দিয়া প্রকৃত ভিক্তর হিউগোর নিভৃত কবিপ্রাণ ছুটিয়াছিল একটা উদার প্রসারিত অধ্যাত্মজগতের ইন্দ্রজাল সৃজন করিতে। ফরাসীর স্বভাবসিদ্ধ তাহার আদিম প্রকৃতির যে সহজ বিগলিত টলটল লঘুতা, তাহাকে সংহত সংযত গাঢ়সত্ত্ব করিয়া তুলেন কর্ণেই—কর্ণেই ফরাসীকে দিয়াছেন রোমকের পুঞ্জ তেজোরাশি, আর ভিক্তর হিউগো দিয়াছেন কেল্‌টিকের অসীমতার বোধ, একটা ভাগবত তুরীয় দৃষ্টি। তাই ফরাসীর সাহিত্যজগতে কর্ণেই ও ভিক্তর হিউগো এক-একটা স্বতন্ত্র স্থানই অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তবুও, কি কর্ণেই, কি হিউগো, কেহই ফরাসীকে একেবারে শ্রেষ্ঠতম শ্রেণীর কাব্য দিতে পারেন নাই। ইংরেজিতে শেক্সপীয়র ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ অথবা কীট্‌সের মধ্যে কবিত্বের আপনারই যে একটা বিশিষ্ট স্বতন্ত্র রস, একটা নিজস্ব রহস্যময় ভঙ্গীর সন্ধান পাই, হিউগো বা কর্ণেইতে তাহা ঠিক পাই না। ফরাসীতে কাব্যের মধ্যেও কেমন একটা ঝোঁক আছে গদ্যেরই প্রকৃতি লইয়া গড়িয়া উঠিতে। কর্ণেই কবিত্বের সমুচ্চ ভঙ্গিমাটি ধরিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার মধ্যে রোমকের বস্তুতন্ত্রতা অতিমাত্র প্রবল—রোমক-প্রতিভার সেই নিথর স্থূলত্ব, যাহা হইতে শক্তি আসিয়াছে, বীর্য্য আসিয়াছে, কিন্তু যাহার ভিতর দিয়া মুক্ত উদার প্রতিষ্ঠানের জ্যোতি, আলোক, সে তুরীয় ভাবসূক্ষ্মতা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। ভিক্তর হিউগো অনেকখানি এই মুক্তির জ্যোতির আলোকের রেখাপাত করিয়াছেন, কিন্তু সে-সকলের সহিত প্রায়শঃই

মিশিয়া রহিয়াছে কবিসুলভ আগ্রহাতিশয্য, প্রচারকের তত্ত্ববাদের আবর্জ্জনা—আপন অনুভূতির মধ্যে সত্যকে উদাত্তকে জোর করিয়া, শেষ করিয়া ধরিবার প্রয়াস; ঋষির দ্রষ্টার নিগূঢ় শান্ত নিরপেক্ষ উদাসীনতা, নিবিড় ধ্যানপরতা সেখানে যথেষ্ট নাই। ফরাসীতে সে পূর্ণ কবিত্বের ইঙ্গিত আর কোথাও যে নাই তাহা বলা দুঃসাহস। অনেক তথাকথিত সাধারণ কবির মধ্যেও সে ইঙ্গিতটি পাই, যেমন—শেনিয়ে, ভিঞি। কিন্তু কবিত্বের এই তুরীয় প্রকৃতি ফরাসী-প্রতিভার স্বভাবগত, ধাতুগত হইয়া উঠিতে পারে নাই। আধুনিক সময়ে মেটারলিঙ্ক ও Libres Vers সম্প্রদায়ের কবিগণ ফরাসী-সাহিত্যে বিশুদ্ধরূপে দিতে চাহিতেছেন কেল্‌টিকের সে ইন্দ্রজাল-বিদ্যা, মানসজগৎ অতিক্রম করিয়া দিব্য অনুভূতির ভঙ্গিমা; কিন্তু তাঁহাদের সৃষ্টিতে এখনও সন্দেহের অনেক আঁধার রহিয়া গিয়াছে, এখনও তাহা স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয় নাই।

ফরাসীর সহিত এ বিষয়ে আমাদের বঙ্গীয় সাহিত্যের অতি আশ্চর্য্য রকম মিল দেখিতে পাই। ফরাসীর ন্যায় বাঙ্গলাতেও আমরা পাই অতিমাত্র স্পষ্টতা স্বচ্ছতা প্রাঞ্জলতা। দেখ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, দেখ ভারতচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্ত—সর্ব্বত্র ভাবে অর্থে ভাষায় শরৎগগনের প্রসন্নতা নির্ম্মলতা মাখা রহিয়াছে। কিন্তু ঠিক এইজন্যই ইহার মধ্যে পাই না তুরীয়ের অতলস্পর্শতা, অজানার প্রহেলিকা, অনন্তের বিপুলত্ব। সেন্ট্‌ ব্যভের মতনই আমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়, Our Bengali poets are too soon read. গ্রীকের স্নিগ্ধ তরলতা সেখানে রহিয়াছে, কিন্তু নাই কেল্‌টিকের সে অসীমের প্রসারে মুক্ত বিচরণ, সে অফুরন্ত অনির্ব্বচনীয় ভাববৈদগ্ধ্য। যাহা বলা হইয়াছে সবই নিঃশেষ করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, অব্যক্তের জন্য কোন স্থান রাখা হয় নাই। বিপুলকে বিরাটকে কোন্ যাদুবলে বাক্যের মধ্যে বাঁধিতে পারা যায় সে গুপ্তবিদ্যা

বাঙ্গালী কবি অধিগত করিতে পারে নাই। বিদ্যাপতির সেই—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল

—এখানে সে যাদুবিদ্যার একটু আভাস পাই। বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসের মধ্যে আরও বেশী পাই। কিন্তু তবুও কেমন মনে হয় মোটের উপর সর্ব্বত্রই একটা পঙ্গুতা, অসম্পূর্ণতার ছায়া মিশিয়া রহিয়াছে। দিব্যভাবের কবিত্বের যে আবহাওয়া, যে প্রাণ, তাহা যেন সেখানে মুক্ত অব্যর্থ রূপে খেলিতে পারে নাই। কাব্য একেবারে ঋষির মুখের গীর্ব্বাণী হইয়া উঠে নাই। আধারের স্বচ্ছতা কোমলতার ভিতর দিয়া অনুভূতি স্পষ্ট, জাগ্রত, এমন কি তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তুরীয় সারস্বত প্রতিভার বিরাট গভীর আবেগটি ধারণ করিবার সামর্থ্য সে পায় নাই।

বঙ্গীয় কবিপ্রতিভার এই অতিমাত্র প্রাঞ্জলতা সরলতা তরলতাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া একটা পূর্ণতর মহত্তর অভিব্যঞ্জনায় ভরপুর করিয়া তুলিবার দুইটি চেষ্টা হইয়াছে। প্রথমে মধুসূদন। ফরাসীতে কর্ণেই যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বাঙ্গলায় মধুসূদন সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। মধুসূদন যে পরিবর্ত্তন সাধন করেন তাহা মুখ্যত ভাষার দিক দিয়া, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার দান কেবল ভাষার ওজঃশক্তি নহে, তাঁহার দান ভঙ্গিমার তেজ। মধুসূদন বাঙ্গলার প্রাণে দিয়াছেন রোমক-প্রতিভার দার্ঢ্য, কবিত্বের যে আত্মপ্রতিষ্ঠ সংহতি। তবুও মধুসূদনের মধ্যে বঙ্গীয় কবিপ্রতিভা একেবারে সমুচ্চগ্রামে উঠিতে পারে নাই। তাঁহার কবি-প্রেরণার প্রতিষ্ঠা প্রাণশক্তি, যে প্রাণশক্তি ছুটিয়াছে কেবলই বাহিরের দিকে, স্থূল বস্তুর প্রতি—সে প্রাণশক্তি চিৎশক্তিতে পরিণত হইতে পারে নাই। ছান্দস্ সাগরের বিপুল কল্লোল তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, কিন্তু ভাবের অনির্ব্বচনীয় জ্যোতি সে সাগরকে উদ্ভাসিত

করিয়া তুলিতে পারে নাই, বস্তুর অন্তরতম যে রহস্য-কথা, যে বিচিত্র লক্ষণা, সেটি তাঁহার চৈতন্যে তার গগনবিসারী ইন্দ্রধনু রচিয়া দিতে পারে নাই। এই দ্বিতীয় চেষ্টা করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ।

পাশ্চাত্যে আজ রবীন্দ্রনাথ মিস্‌টিক (mystic) কবি নামে পরিচিত। পাশ্চাত্য যে হিসাবে এই নামটি দিয়াছে তাহার সবখানি সঙ্গত হউক বা না হউক, উহা যে একেবারে নিরর্থক তাহা আমরা বলিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথের ধাতুতে স্থূলত্ব বা কাঠিন্য বলিয়া জিনিষটি যেন আদৌ নাই, তাঁহার প্রতিষ্ঠান এ জগতে নয়, যেন কোন কল্পলোকের শুভ্রবিগলিত লাঞ্ছনায়। তাঁহার প্রাণের তন্ত্রী আশ্চর্য্য রকম সূক্ষ্ম সজাগ, তাঁহার অনুভূতি অতি তীক্ষ্ণ অতি গভীর, তাঁহার কল্পনা সর্ব্বদা জগতের স্থূল হস্ত এড়াইয়া উড়িয়া উড়িয়া চলিয়াছে, অন্বেষণ করিয়াছে নূতন কিছু, সুদূরের কিছু, অজানা অচেনা কিছু। তাই বাস্তবিকই তাঁহার মধ্যে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে অতীন্দ্রিয়ের অশরীরীর, সেই অজ্ঞাতের অনন্তের একটা 'কিমিব কিমিব' স্পর্শ—তাঁহার বাক্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে বাক্যে যাহা ধরা যায় না এমনি একটা তুরীয় অথচ অতি অন্তরঙ্গ ভাবের আবেশ। স্থূল ইন্দ্রিয় যাহাকে অঙ্গে অঙ্গে অতিমাত্র প্রকট করিয়া ধরিয়াছে, বুদ্ধি যাহার সকল অর্থই নিঃশেষ করিয়া অধিগত করিয়াছে, এমন কিছুতেই রবীন্দ্রনাথের তৃপ্তি নাই। তিনি খুঁজিয়াছেন কেল্‌টিকের সেই অনন্তের দ্যোতনা, সব শেষ করিয়া বুঝার পরেও যাহার শেষ হয় না, বস্তুর সেই সুরটি যাহা অন্তরাত্মার পরতে পরতে লুকাইয়া আছে, যেটিকে ধরিয়াই আমরা অসীমের কোলে মনপ্রাণ লইয়া উধাও হইয়া চলি।

কিন্তু এই যে অসীমের স্পর্শ অনন্তের ইঙ্গিত, রবীন্দ্রনাথ তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিয়াছেন গৌণভাবে—প্রাণের একটা মৃদুল আবেশ, একটা ভাববিমুগ্ধতার মধ্য দিয়া। দৃষ্টির যে স্পষ্টতা পূর্ণতা দৃঢ়তা, সে

জিনিষটি রবীন্দ্রনাথে ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। তাঁহার লক্ষ্য অনন্তের আনন্ত্যটুকু, বস্তুর নিবিড় রহস্যটুকু, সৃষ্টির যে অনির্ব্বচনীয় প্রহেলিকা তাহাই অক্ষুণ্ণ জাগ্রত রাখা,—তাই তিনি যেন চক্ষু মেলিয়া দেখিতে চাহেন নাই, পাছে দৃষ্টির পূর্ণালোকের রূঢ় স্পর্শে সে আনন্ত্য, সে রহস্য, সে প্রহেলিকা কিছু মলিন খর্ব্ব হইয়া যায়। তাই তাঁহার মধ্যে পাই অতি-সন্তর্পণতা, একটা দ্বিধা। অজানাকে জানিতে চাহেন নাই, চাহিয়াছেন কেবল অনুভব করিতে, অনন্তের পথে চলিতে চাহিয়াছেন কুহেলিকায় আবৃত হইয়া, শিশুটির মত চারিদিকে হাতখানি বাড়াইয়া দিয়া। সহজ বোধ, সূক্ষ্ম অনুভূতির সহায়ে যে গভীর সত্য, যে দিব্য ভাবটি পাইয়াছেন তাহার মধ্যে অনন্তের অবাঙ্‌মনসগোচরের অভিব্যঞ্জনাটি অব্যাহত রাখিবার জন্যই একটা পর্দ্দা, একটা অবগুণ্ঠন তাহার উপর টানিয়া দেওয়া তিনি প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। তাই দেখি, তাঁহার সত্য অতি গভীর, অতি সূক্ষ্ম, অতি উদার হইলেও তাহাতে মিশিয়া রহিয়াছে একটা সন্দেহেরই অস্পষ্টতা, তাঁহার অনুভূতিতে রহিয়া গিয়াছে কি একটা আবছায়া, কেমন এক নেশার ঘোর। তাঁহার ভাব ও ভাষা চলিয়াছে ঘুরিয়া ফিরিয়া লতাইয়া লতাইয়া—তাঁহার ভঙ্গিমায় পাই একটি রহস্যগর্ভ চতুরতা, কিন্তু পাই না দ্রষ্টার চোখে ফুটিয়া উঠে যে অব্যর্থ রেখাসম্পাত, আত্মার যে মূর্ত্ত বিগ্রহ। রবীন্দ্রনাথ বস্তুকে দেখাইতে চাহিয়াছেন কেবল ইঙ্গিতে, লক্ষণার সহায়ে, কিন্তু সেইসঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছে অনেকখানি অবান্তর অতিরিক্ত নিষ্প্রয়োজনীয়কে লইয়া খেলাধূলা। কিন্তু সত্যকে অনন্তকে বৃহৎকে পূর্ণদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছেন যে ঋষিকল্প শিল্পী তাঁহার সৃষ্টিতে সন্দেহের সন্তর্পণতার কুহেলিকা নাই, সেখানে পূর্ণ যথাযথ অর্থ আছে, আছে বস্তুটিকে ঋজুভাবে স্ফুটভাবে নির্দ্দেশ করা, অথচ সে রহস্য সে প্রহেলিকার কিছু অঙ্গহানি সেখানে হয় নাই, সেটি অবিকৃতই রহিয়াছে। মানস জগৎ

ছাড়াইয়া রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন তুরীয় জগৎ, কিন্তু তুরীয়েরও একটা মানসসত্তা আছে সেইটুকু রবীন্দ্রনাথ ধরিতে পারেন নাই—তিনি তুরীয়কে আলিঙ্গন করিতে চাহিয়াছেন কেবল ভাবুকতার আবেগে—তপঃশক্তির তীব্রলেখায় তাহাকে জাজ্বল্যমান করিয়া ধরিতে চান নাই। বস্তুত আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথও মুমুক্ষু মাত্র—মুক্ত নহেন। সারস্বত-সাধনায় তিনি বোধ হয় শেষ সোপানে উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু এখনও আছে একটা যবনিকা যাহা তিনি ভেদ করিতে পারেন নাই—ভেদ করিতে চাহিতেছেন না, তাঁহার যেন কেমন আশঙ্কা সে যবনিকা না থাকিলে সমুচ্চের রহস্যও কিছু থাকিবে না। তাই রবীন্দ্রনাথ ভাবুকতার চরম, কিন্তু তিনি ভাবসিদ্ধ হইতে পারেন নাই—তাঁহার ভাবুকতা দিব্যদৃষ্টির সে অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্বে জাগ্রত স্থিরপ্রতিষ্ঠ হয় নাই।

মধুসূদন রোমকের শক্তি পাইয়াছেন, কিন্তু পান নাই গ্রীকের ছিল যে অর্থগৌরবের গভীরতা, মুক্ত সুবলয়িত চারুতা, পান নাই তিনি কেল্‌টিকের ভাবস্থির রহস্য। রবীন্দ্রনাথ কেল্‌টিকের সে অনন্ত লক্ষণা, গ্রীকের অর্থমনোজ্ঞতা পাইয়াছেন, কিন্তু রোমকের তপঃশক্তির অভাবে সে ভাবরহস্য পর্য্যবসিত হইয়াছে গৌণ অনিশ্চিত ইঙ্গিতের কুয়াসায়, সে অর্থসম্পদ পরিণত হইয়াছে কেমন সামর্থ্যহীন তরলিত স্বপ্নের বিহ্বলতায়।

প্রবাসী : আষাঢ়, ১৩২৫

স্বদেশী সাহিত্য

স্রোতের জল সব সময় শুদ্ধ। শত ময়লা আবর্জ্জনা তাহার মধ্যে ঢালিয়া দিতে পার, তবু সে জল কখন অস্পৃশ্য হইয়া পড়ে না। বদ্ধ জলের জন্য কিন্তু সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতে হয়, ব্যবহারের যোগ্য করিয়া রাখিতে হইলে প্রতি নিমেষে দৃষ্টি দিতে হয়, পাছে বাহিরের আবর্জ্জনা কিছু তাহাতে পড়ে, পাছে শেওলা আসিয়া ঢাকিয়া ফেলে।

বদ্ধ জলের মত দাস-জাতিরও অনেক আপদ। যে জাতি পরের অধীন, আপন স্বাতন্ত্র্য যাহার তেমন জাগরূক নাই, নিজের অন্তরাত্মাকে যে প্রতি মুহূর্ত্তেই হারাইতেছে, সে চায় কোথায় তাহার বৈশিষ্ট্যটুকু তাহারই খোঁজ করিতে, কোন্ জিনিষের মধ্যে তাহার আপন-বোধটুকু অক্ষুণ্ন রাখিতে পারে সেটুকুকে অতি সাবধানে সন্তর্পণে জিয়াইয়া রাখিতে, পরের স্পর্শ হইতে এই নিজের বলিয়া একটি কোট কোন প্রকারে বজায় রাখিতে। কিন্তু স্বাধীন জাতি, আপনার প্রাণে প্রাণে যে মুক্ত জীবনের বেগ অনুভব করিতেছে, সে যাহাই করুক না কেন, যেখানেই যাউক না কেন, সকলের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যের, আপন অন্তরাত্মারই বৈভবের সন্ধান পাইতেছে। বাহিরের অপরিচিতের স্পর্শ হইতে সে কখন আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া রাখে না—সে মিলিয়া মিশিয়া, সকলের সহিত অম্লান চিত্তে কোলাকুলি করিয়া চলাফেরা করে; কোথাও বোধ করে না যে তাহার নিজত্বের, তাহার আত্মমহিমার কিছু অপচয় ঘটিতেছে।

ব্রহ্ম যাহার মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে, তাহারই দৃষ্টি সর্ব্বদা আচার নিয়ম অনুষ্ঠান বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ। একটা বিশেষ প্রকরণ,

বিশেষ ধারাকেই সে আলিঙ্গন করিয়া থাকে; তাহার আতঙ্ক, ইহা ছাড়া আর যাহা কিছু সে-সব সয়তানের প্রলোভন, তাহাকে বিপথে লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু ব্রহ্ম যাঁহার মধ্যে জাগ্রত, স্বরাট্ যিনি, তাঁহার কোন গণ্ডী নাই, তিনি সম্রাট্, বিশ্বই তাঁহার লীলাক্ষেত্র। আত্মার অনন্ত শক্তি, অনন্ত প্রতিভা যে ভুলিয়াছে সে-ই নাম-রূপের মোহে আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতেছে, বলিতেছে, এই নামটি এই রূপটিই সব, এইটুকু গেলে সবই গেল। কিন্তু আত্মার—তাহা ব্যষ্টিরই হউক আর সমষ্টিরই হউক, জাতিরই হউক আর গণেরই হউক—কোন আত্মারই বিভূতির শেষ নাই। আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত যিনি, নাম-রূপ বদলাইতে তাঁহার কোন কুণ্ঠা নাই। তিনি জানেন, বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি।

বর্ত্তমানে বাঙ্গলাদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে একটা দলাদলি দেখিয়া আমাদের এই কথা মনে হইতেছে। একদল সাহিত্যিক বাঙ্গলার যে প্রাণের কথা, যে বিশিষ্টতা, তাহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সকল দেশভক্তকে আহ্বান করিতেছেন। দেশের মাটির উপর আমাদের অধিকার নাই, ব্যবসা বাণিজ্য শাসনকার্য্যও পরের করতলগত, ইহা সহ্য করিলেও করা যাইতে পারে। কিন্তু দেশের মন, তাহার দীক্ষা, তাহার কাব্যকলা—দেশের অন্তরাত্মা যেখানে, সেখানে যেন পরের মন, পরের শিক্ষা দীক্ষা আসিয়া না অধিকার করে। এই স্বদেশভক্তগণ বাঙ্গলার প্রাণের ধারার একটা সুর ধরিয়া দিতেছেন, বলিতেছেন, "হে বাংলার কবি, এই সুরকে ভুলিও না, এইখানেই তোমার অন্তরাত্মা, বিদেশীর সাহিত্যের সুরে এই দেশী সুরটি মিশাইয়া হারাইয়া ফেলিও না। বাংলার প্রাণ হইতেছে বৈষ্ণবের প্রাণ, তাহার সাহিত্যের মৌলিক সুর পদাবলীর সুর।"

প্রত্যুত সাহিত্যে এই দেশাত্মক শুচিব্যাধি আজকাল বিশেষভাবে দেখি আমরা দুইটি পরাধীন জাতির মধ্যে—ভারতবর্ষে আর আয়র্লণ্ডে।

আয়র্লণ্ড চাহিতেছে ইংলণ্ডের প্রভাব হইতে মুক্ত এক জাতীয় সাহিত্য, যাহার মধ্যে আয়র্লণ্ডের বিশেষত্বটুকুই ফুটিয়া উঠিবে, ইংরেজি সাহিত্যের ছায়া যাহাকে স্পর্শ করিবে না। ইহাই কেল্‌টিক জাগরণ (Celtic Revival)। আর ভারতে বাঙ্গলাদেশেও দেখিতেছি সেই রকম একটা চেষ্টা চলিয়াছে যাহা চায় বাঙ্গলারই প্রাণের কথা, ইংরেজের বা বিদেশীর প্রভাবের পূর্ব্বে একান্ত বাঙ্গালীর বাঙ্গলার ক্ষেত্রজাত ছিল যাহা, তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, অর্থাৎ সেই বৈষ্ণব যুগ। কিন্তু দুইটি আন্দোলনের মধ্যে মস্ত একটি পার্থক্য আছে। Celtic Revival অর্থাৎ কেল্‌টিক জাগরণের গোড়ায় যে ভাবই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে আয়র্লণ্ড আইরিশ প্রতিভা অর্থে যে জিনিষটি ধরিয়াছে, তাহা একটা উদারতর মহত্তর বস্তু; আইরিশ জাতির মধ্যে সে জিনিষটি যতই বিশেষভাবে থাকুক না, তাহা কেবল আয়র্লণ্ডের প্রাণের কথা নয়, তাহা প্রত্যেক জাতিরই বর্ত্তমান যুগের প্রাণের কথা—সে একটা গোটা শিক্ষা দীক্ষা—কেল্‌টিক প্রতিভা লাতিন বা টিউটনের মন যাহা তেমন ধরিতে পারে নাই, মানুষের সেই নিগূঢ় আধ্যাত্মিক স্পৃহা, সমুচ্চের রহস্যের প্রতি টান। তাহার উৎপত্তি দেশাত্মক অভিমানের মধ্যে হইলেও, ক্রমে এই গণ্ডীকে সে ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। এইজন্যই কেল্‌টিক জাগরণ রক্ষা পাইবে, কারণ জগতের সাথে সে আপনাকে মিলাইতে পারিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার পদাবলী সাহিত্যের পুনঃস্থাপনচেষ্টার মধ্যে এই রকম বিশ্বতোমুখ ভাব কিছু দেখি না—এখানে দেখি প্রাচীনের অনুকরণের একটা মিথ্যা প্রয়াস মাত্র। মিথ্যা, কারণ এই বৈষ্ণব আদর্শ অর্থাৎ ইহার যে বিশেষ রূপটি বৈষ্ণব আচার্য্যগণ দিয়া গিয়াছেন, তাহা এক দিকে যেমন বিশ্ব-আদর্শ নয়, অন্য দিকে বাঙ্গলার প্রাণের সব কথাও সেখানে নাই। বিশেষত যখন দেখি বৈষ্ণব ভাবের সার্ব্বভৌমিকত্ব যেদিকে সেদিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া জোর দিতেছি কেবল তাহার

বাহ্য প্রকরণের উপর, তখন আমরা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি যে এ প্রয়াস টিঁকিবে না।

কালধর্ম্মে পদাবলী সাহিত্য হইতে আমরা বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বৈষ্ণব কবিগণ যে ভাবে যে দৃষ্টিতে জগৎকে জীবনকে মানুষকে দেখিতেন আমরা আজ ঠিক সেই একই প্রকারে দেখি না, দেখিতে পারি না। বৈষ্ণব কবিতা যতই সুন্দর যতই মহৎ হউক না কেন, তাহাই যে কবিত্বের একমাত্র আদর্শ, অথবা তাহাই যে চিরকাল বাঙ্গলার কবি-প্রাণের কথা হইয়া থাকিবে—জগৎ, এমন কি বাঙ্গালী জাতিও যে সে-রকম একটা স্থাবর জিনিষ, এমন বোধ হয় না। ভাবের স্রোত চিরদিনই নূতন খাতে নূতন দৃশ্যের মধ্য দিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিবে, তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে কে, ভাগীরথীকে আবার গঙ্গোত্রীতে লইয়া যাইবে কে? বাঙ্গলার এই যে মানসিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন, তাহা শুধু মোহ, শুধু অনুচিকীর্ষার ফল, এ কথা বলিতে পারি না। বর্ত্তমানের বাঙ্গলা সাহিত্য যে ইংরেজি সাহিত্যের সুক্ষীণ ক্ষণভঙ্গুর প্রতিধ্বনি মাত্র তাহাও নয়। আমরা দেখিতেছি ইংরেজ উপলক্ষ—নিমিত্ত মাত্র, ইহাকে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গলাদেশে সমস্ত জগতে যে হাওয়া বহিতেছে সেই 'জাইট-গাইস্ট' (Zeit-Geist), সেই কাল-পুরুষের অঙ্গুলিসঙ্কেতেই আজ আপনাকে ভাঙ্গিয়া নিত্য নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে।

বলিতে পার—পরিবর্ত্তন চাই, পরিবর্ত্তন হইবেই; কিন্তু দেখা উচিত যাহাতে প্রাণটি না হারাইয়া ফেল; তোমার সাহিত্যের যাহা অন্তরাত্মা, যে প্রতিভা, তাহার উপর পরধর্ম্ম চাপাইয়া পিষিয়া মারিও না। কথাটি থিয়োরী হিসাবে খুবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু কার্য্যত কে আমায় দেখাইয়া দিবে এইখানে আমার সাহিত্যের স্বধর্ম্ম, আর এইখানে পরধর্ম্ম; এইটিই আমার প্রাণ, আর ওইটি আমার মরণ? প্রাণের

পরিচয় প্রাণে, কোন একটি বিশেষ রূপ বা ভঙ্গিমার অভাব হইলেই যে জিনিষকে মৃত বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে তাহা নয়। বিশেষত তোমার দেওয়া মানদণ্ড আমি স্বীকার করিয়া লইতে ইতস্ততই করিব। কারণ, দেখিতেছি তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার মর্য্যাদার দোহাই দিতেছ, কিন্তু সাহিত্য বা শিল্পের জগতে জাতির অপেক্ষা বড় কথা হইতেছে বিশ্ব। জাতীয়ত্বের সঙ্কীর্ণতা লইয়া তুমি কবি—বিশ্বদ্রষ্টা—হইতে পার না।

আমরা আরও আশ্চর্য্যান্বিত হই, রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁহারা দেশকে জাগ্রত সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন, বিশ্বের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া নয়—ইংরেজের সহিতও নয়—যাঁহারা দেশের উন্নতির একমাত্র পন্থা, একমাত্র না হইলেও প্রধান পন্থা রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন দলে দলে বিদেশগমন, বিদেশের জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভারে, বিদ্যার নৈপুণ্যে মণ্ডিত হইয়া আসিতে—সাহিত্যক্ষেত্রে আবার তাঁহারাই উপদেশ দিতেছেন বিদেশীর ছায়া না মাড়াইতে, বলিতেছেন সাহিত্যসৃষ্টির জন্য ইংরেজের কাছে যাইও না, যাও তোমার পূর্ব্বপুরুষদের কাছে—শত শত বৎসর পূর্ব্বে তুমি কি ছিলে, সেইখানেই তোমার সব আদর্শ, সেইখানেই তোমার অন্তরাত্মা।

জগতে এমন কোন জাতি নাই যে উৎপত্তি হইতে এযাবৎকাল তাহার রক্তের শুদ্ধতা বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। এমন জাতি বোধ হয় হইতেও পারে না; বর্ণসঙ্করই বিভিন্ন জাতির উৎপত্তির কারণ। সেই রকম, জগতে এমন সাহিত্য সুদুর্লভ যাহা স্বয়ংসিদ্ধ; বিশেষত আধুনিক কালে যখন সমস্ত মানবজাতির মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ অচ্ছেদ্য আদান-প্রদান চলিতেছে, তখন ইচ্ছা করিলেই কোন্ জাতি কূর্ম্মের মত আপনার মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? বরং ইহাই আমরা দেখি যে বিদেশীয় বিজাতীয় সাহিত্যের সহিত অবাধ মিশ্রণেই সব সজীব সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে।

ধর ইংরেজি সাহিত্যের কথা। ইংরেজি সাহিত্যের যে তিনটি মহা যুগ তাহাদের প্রত্যেকটির গোড়ায় রহিয়াছে এই রকম এক-একটি বৈদেশিক প্রভাব। প্রথম যুগের ইংরেজি সাহিত্যের উৎস যিনি—চসার্—তিনি তাঁহার কবিপ্রেরণা লইয়া আসিয়াছিলেন ফ্রান্স এবং ইতালী হইতে। তার পর মধ্য যুগ অর্থাৎ এলিজাবেথীয় যুগের আরম্ভ যাঁহাদের হইতে—সেই ওয়াট্ (Wyatt) এবং সারে (Surrey)—তাঁহারা বীজ আনিয়াছিলেন ইতালী হইতে। আর ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ্ তাঁহার নিজের যুগ প্রবর্ত্তন করেন প্রথমে ফরাসী দেশে, পরে তাঁহার সতীর্থ কোল্‌রিজের সাথে জর্ম্মনী দেশে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া। ইদানীন্তন কালে ইংরেজি সাহিত্যে আবার একটা নূতন ঢেউ উঠিয়াছে, একটা নূতন যুগেরই প্রবর্ত্তনা হইতে চলিয়াছে। ইহারও প্রথম কবিগণ দেখি বিদেশের অপরিচিতের নিকট হইতেই তাঁহাদের নূতন প্রেরণা পাইয়াছেন। রসেটি গিয়াছেন প্রাচীনতর ইতালীয় ও ফরাসী কবিদের কাছে, মরিস্ গিয়াছেন স্কান্দেনেভিয়ার সাগা-সাহিত্যের (Sagas) কাছে, সুইন্‌বার্ণ গিয়াছেন এক রকম সকল বিদেশীরই কাছে, বিশেষত আধুনিক ফরাসী কবিদের কাছে। ইঁহাদের লক্ষ্যই যেন ছিল বিদেশের সহিত এত আদান-প্রদান সত্ত্বেও ইংরেজের যে একটা দ্বীপবাসীসুলভ সঙ্কীর্ণতা, নিজত্বের অভিমান কেমন রহিয়া গিয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ইংরেজি সাহিত্যকে বিশ্বজনের সাহিত্য করিয়া তুলিতে। আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রাচ্যের, বিশেষ ভারতবর্ষেরও, যে অনেকখানি প্রভাব আছে তাহাও এইখানে স্মরণ করা যাইতে পারে।

ফরাসী সাহিত্যও যদি ইতালী স্পেন জর্ম্মনী ও ইংলণ্ডের প্রাণ অনেকখানি আত্মসাৎ করিতে না পারিত, তবে সে সাহিত্য তাহার আদিম ত্রুভেয়্যার ও ত্রুবাদুর (Trouvères, Troubadours)

গানের মধ্যেই সমাপ্ত হইয়া যাইত। আর আমরা দেখি সমস্ত লাতিন সাহিত্যই ত গ্রীকের ছায়ায় গড়িয়া উঠিয়াছে, লাতিন কবিত্বকে গ্রীকের প্রতিধ্বনি বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কে বলিবে লাতিন সাহিত্যে প্রাণ নাই, বা তাহা লাতিন জাতিরই আপনার অভিব্যক্তি নয়? গ্রীকবন্যার বিরুদ্ধে আপন দেশের 'প্রাণের কথা'টি অটুট রাখিবার জন্য স্বদেশাভিমানী কেটো (Cato) কতই চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই অবশেষে জাইট্-গাইস্টের তরঙ্গে ভাসিয়া গেলেন—অশীতিবৎসরবয়স্ক বৃদ্ধ গ্রীকভাষা শিক্ষায় মনোযোগ দিলেন।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের জীবনেও আমরা দেখি তিনটি সন্ধিস্থল। এবং এই তিনটি মুহূর্ত্তে তিনজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে। ইঁহারা তিনজনেই যে নবজীবনের স্রোত বহাইয়া দিয়াছেন তাহার উৎস তাঁহারা পাইয়াছেন পাশ্চাত্য হইতে, অথবা আরও ঠিক ঠিক বলিতে গেলে ইংলণ্ড হইতে। প্রথম রামমোহন, দ্বিতীয় মধুসূদন, তৃতীয় রবীন্দ্রনাথ। নব্য বঙ্গসাহিত্যে ইঁহারা প্রত্যেকেই এক-একটি যুগের প্রবর্ত্তক; বিদেশ হইতেই তাঁহারা নূতন ভাব, নূতন ভঙ্গিমা আনিয়া বঙ্গমাতাকে উপহার দিয়াছেন, বাঙ্গলাকে নিজের ঘরের গণ্ডী হইতে বাহিরে আনিয়া জগৎসভার মাঝে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বঙ্গে কবি-সম্প্রদায়ের যে কখন একান্ত অসদ্ভাব ছিল তাহা নয়, তাঁহারা পদ্য লিখিয়াছেন যথেষ্ট। চণ্ডীদাসের সময়ে, চৈতন্যের যুগে, নবাবী আমলে বাঙ্গলার সাহিত্য-বীণা থাকিয়া থাকিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সে মূর্চ্ছনা কখন একটা বিশেষ ঘাট বা পর্দ্দা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই, তাহা খেলিয়াছে ঐটির নীচে নীচে থাকিয়াই। কবিত্বের মুক্ত পরিপূর্ণ জীবনটি কোথাও আমরা পাই না। সেই মহা জীবন-নদের মুখ খুলিয়া দিলেন পাশ্চাত্যভাব-সম্পৃক্ত রামমোহন। মধুসূদন বজ্রতাড়নে দুই কূল ভাঙ্গিয়া তাহার জন্য বিস্তৃত উন্মুক্ত খাত কাটিয়া দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সেই খাতে বহাইয়া দিয়াছেন উচ্ছ্বসিত তরঙ্গায়িত বহুভঙ্গিম-রুচির এক মহাপ্লাবন।

ঠিক এই তিনজনের বিরুদ্ধেই দেখি বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন রূপে প্রতিবাদ উঠিয়াছে। বাঙ্গালীকে যাঁহারা আপন ঘরের কোণে বাঁধিয়া না রাখিয়া, একটা বিশ্বপ্রাণে ভরপুর করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা নাকি শুধু বিদেশীভাবাপন্ন; বাঙ্গলার প্রাণে যাহা খাপ খায় না, কোন দিন খাপ খাইবে না, এমন-সব ভাব ভঙ্গিমা তাঁহারা আনিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু জীবন্ত সকল সাহিত্যের প্রকৃতিই যে এই রকম—সে তাহার উপকরণ চারিদিক হইতে আহরণ করে, এবং এই ক্ষমতা তাহার যত বিস্তৃত, জগৎসাহিত্যের যত রকম বৈচিত্র্যের সহিত সে সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে, ততই তাহার সমৃদ্ধি মহত্ত্ব। ভারতে ইংরেজ-অধিকার দুর্ভাগ্যের কথা বটে। কিন্তু বিধাতা দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়াই সৌভাগ্য সৃজন করিয়া চলিয়াছেন। এ কথাটি আবার ভুলিলে চলিবে না ইংরেজেরই মধ্যবর্ত্তিতায় আজ আমরা মানবজাতির সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে পারিয়াছি, ইংরেজি সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আমরা জগৎ সাহিত্যের যাহা কিছু পরিচয় পাইয়াছি। রামমোহন যে ইংরেজি শিক্ষাকে হেয় মনে করেন নাই, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ যে ইংরেজি সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে কুণ্ঠিত হন নাই—ইহা বাঙ্গলার, বাঙ্গলা সাহিত্যের পরম সৌভাগ্যের কথা। ভারতবর্ষের সকল ভাষার মধ্যে বাঙ্গলাই যে এত উচ্চস্থান লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহার একটা কারণ—তাহার প্রধান কারণ রূপেই আমরা নির্দ্দেশ করিতে পারি—এই বিদেশী সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা। প্রথম বিদেশীভাবপ্লাবনে বাঙ্গলা যদি অতখানি আপনাকে না ছাড়িয়া দিত, যদি জাতিনাশের ভয়ে পিছাইয়া থাকিত, তবে আজ জগতের সাহিত্যের মহাজীবনস্রোত হইতে সে বিচ্যুত হইয়াই পড়িত। আমরা পদাবলী সাহিত্যের চর্ব্বিতচর্ব্বণই

করিতাম, কিন্তু পাইতাম না 'মেঘনাদবধ', পাইতাম না 'কপালকুণ্ডলা', পাইতাম না 'ক্ষুধিত পাষাণ' 'উর্ব্বশী' 'সোণার তরী'।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস আমাদের নমস্য। তাঁহাদের মধ্যে যে কবিত্বের মূলশক্তি খেলিয়াছে, অধুনাতন আর কোন কবির মধ্যে সে শক্তি ততখানি খেলিয়াছে কি না—মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিশক্তি সৃজন-প্রেরণা মহীয়ান, না বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের দৃষ্টিশক্তি সৃজন-প্রেরণা মহীয়ান—ইহাও আমরা বিচারের বিষয় করিতে পারি। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা মানিতে পারি না, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস যে ভাব যে ভঙ্গিমা দিয়াছেন, বাঙ্গলার কবি-প্রতিভার তাহাই সব কথা। তাঁহারা যে রসের সন্ধান পাইয়াছেন, আনন্দের যে তরঙ্গটি তাঁহাদের সৃষ্টিতে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে, আমরা বর্ত্তমান যুগের কবি যদি ঠিক সেই রস সেই আনন্দটি না পাই, তবে আমরা হীন পংক্তিভ্রষ্ট হইয়া পড়িব কেন? রসের শত ধারা, আনন্দের সহস্র রেখা—প্রত্যেক ধারার আবার কত ভঙ্গী, প্রত্যেক রেখার কত সূক্ষ্ম বর্ণপাত—সেইজন্যই যুগে যুগে কবিতে কবিতে এত পার্থক্য। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের যুগে রসের আনন্দের এক রূপ লইয়া ছিলেন, আমরা আমাদের যুগে আর-এক রূপ লইয়া আছি। ইহাদের একটি যে কবিত্বের সনাতন স্বরূপ, আর-একটি যে ক্ষণিক বিকৃতি, এমন বলিতে পারি না।

আমরাও স্বীকার করি, দেশীয় জাতীয় সাহিত্য বলিয়া একটা সত্য জিনিষই আছে। প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক মনুষ্য-সঙ্ঘের একটা বিশেষ প্রাণ বা আত্মা আছে, এবং সাহিত্যে সেই বিশেষত্বও ফুটিয়া উঠে ও উঠা দরকার। আর এই অন্তরাত্মার বিশেষত্বের সহিত যাহার কোন সংস্রব নাই, তাহা বিদেশ হইতে আমদানী হউক আর দেশের ভিতরেই তৈয়ারী হউক, সে জিনিষ কি দেশীয় কি বিদেশীয় কোন সাহিত্যই নয়—তাহা যে কৃত্রিম, তাহা জীবন্ত কিছু নয়, সুতরাং

সাহিত্যও নয়। কিন্তু এই দেশী সাহিত্যের প্রাণ যাহাকে বলি তাহা অতি সূক্ষ্ম ছায়াময় পদার্থ। তোমার আমার বিশেষ অভ্যাস বা বিশেষ সংস্কারের মানদণ্ড দিয়া তাহাকে নির্দ্ধারণ করিতে গেলে ভুলই হইবার সম্ভাবনা। সে জিনিষটি অনুভব করিলেও করিতে পারি, কিন্তু কথার মধ্যে ধরিতে গেলে তাহা প্রায়শই সঙ্কীর্ণ খণ্ডিত হইয়া উঠে। কোন বিশেষ ধারা বা রূপটি, বিশেষ আদর্শ বা ধর্ম্মকে একান্ত করিয়া ধরিয়া সেই অনুসারেই জাতির সকল সাহিত্য-প্রেরণা গড়িয়া তুলিলেই যে দেশীয় বা জাতীয় সাহিত্য হয়, তাহা আমরা মনে করি না। কারণ, আত্মা বা প্রাণ এমন জিনিষ যাহা এক ভাবে এক ভঙ্গিমায় প্রকাশিত হইতে হইতেই ঘুরিয়া আবার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে বিপরীত ভঙ্গিমায় ফুটিয়া উঠিতে পারে—আত্মার প্রাণের এ সামর্থ্য এ প্রতিভা এ রকম বিভূতি আছে। ইহার উদাহরণও জগতের সাহিত্যে বিরল নহে। কিন্তু মানুষের মন চায় বিকাশের বিবর্ত্তনের একটা ধরাবাঁধা ক্রম, যে সামঞ্জস্য সহজ বুদ্ধিতে বুঝা যায়; সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাহিরের শত বিভিন্নতা সত্ত্বেও অন্তরাত্মার যে নিগূঢ় ঐক্য তাহা ধরিতে পারে না, স্থূলের মিলনকেই শুধু বড় করিয়া দেখিতে জানে।

আমরা এ কথাও স্বীকার করিতে রাজী যে, জাতির এক-একটা সময় আসে যখন বাহিরের বিদেশীর অতিমাত্র চাপ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত চারিদিকে তাহার এক রকম দেউল তুলিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্তই মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু সে প্রয়োজন হয় জাতির যখন মুমূর্ষু অবস্থা, তাহার জীবনীশক্তি অতিক্ষীণ। এটিকে আদর্শ করিয়া সনাতন সত্যধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। বরং আমরা বলিব জীবনীশক্তিকে বাড়াইয়া তুলিবার একটা পন্থাই হইতেছে বাহিরের সহিত আদান-প্রদান, পর হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিয়া দূরে রাখিয়া নয় কিন্তু তাহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহার সমান হইয়া চলিতে

চেষ্টা করা। ভয়ে ভয়ে চলিলে প্রাণ সঙ্কুচিত হইয়া আসে, মৃত্যুই তাহার অব্যর্থ পরিণাম।

এ ভয় দূর করিতে পারেন সেই কবি, আশার শক্তিমন্ত্র দিতে পারেন সেই ঋষি যিনি প্রাচীন-নবীন বলিয়া আপন-পর বলিয়া কোন বিশেষ শাস্ত্রকে আঁকড়িয়া ধরেন নাই, যিনি উঠিয়া গিয়াছেন এ দ্বৈতের উপরে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একজন বলিতেছেন—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। তিনি হইতেছেন কবির অন্তর্য্যামী সারস্বতপুরুষ, কবির আত্মা—এই আত্মাকেই কবি দেখিবেন, সৃজন করিবেন—আত্মানমেব কল্পয়েৎ। কবির এই অন্তরাত্মার জগতে স্বদেশ-বিদেশ ততখানি নাই, যতখানি আছে একই অখণ্ড বিশ্বদেশ।

প্রবাসী : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫

বিশ্বসাহিত্য

ভিক্তর হিউগো বলিতেন, সেই কবিতাই প্রকৃত কবিতা, তাহাই কবিতার শিরোমণি যাহার মধ্যে পাই একটা বৃহতের ভাব—Immensité—বিশালতা, বিপুলতা। তাই তাঁহার প্রিয় কবি ছিল এস্‌খিল, লুক্রেশ, শেক্সপীয়র, কর্ণেই। তিনি যদি সংস্কৃত সাহিত্যের কথা জানিতেন তবে সেই সঙ্গে বাল্মীকি ও বৈদিক ঋষিগণেরও নাম করিতেন। বস্তুত কবিতা হইতে, শুধু কবিতা কেন—সকল চারুকলা হইতেই আমরা যে জিনিষটি উপভোগ করিতে চাই তাহা হইতেছে এই একটা অনন্তের অসীমের অভিব্যঞ্জনা, প্রাণ যেখানে খুলিয়া গিয়াছে, দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া সমগ্রকে বিশ্বকে সে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিতেছে। এই বিশ্বের হাওয়া যেখানে পাই না, সে শিল্পসৃষ্টি যতই মনোরঞ্জক, যতই চমৎকার, যতই সূক্ষ্ম বা নিবিড় হউক না কেন, তাহাকে কেমন অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে পঙ্গু নাম দিতেই ইচ্ছা যায়। আর যেখানে এই জিনিষটি পাই সেখানে আর কিছু থাকুক বা না থাকুক, তাহা অতি সাধারণ কথাই হউক, তত্ত্বসম্পদে বা অর্থগৌরবে তাহা মহনীয় না হউক, তবুও সেখানে কথা তত্ত্ব অর্থ অপেক্ষা বড় কি একটা জিনিষই পাই, আমরা সেখানে তৃপ্ত, চিত্ত সেখানে আমাদের কেমন ভরাট হইয়া যায়। বস্তু বিষয় চিন্তা ভাবুকতা যাহাই বল না, তাহা যেন কবিতার মর্ম্মের কথাটি নয়—এ-সকলের মধ্য দিয়া বা ইহাদিগকে ছাড়াইয়া চাই একটা অনন্তের বিসার, বিশ্বতোমুখী তরঙ্গোল্লাস।

এই রকম একটা বেলাহীন মহাসাগরের কোলেই যেন দুলিতে থাকি যখন শুনি শেক্সপীয়রের

And rock his brains

In cradle of the rude imperious surge—

অথবা হিউগোর নিজেরই

Le pâtre promontoire au chapeau des nuées

S'accoude et rêve au bruit de tous les infinis—

সেই একই বিপুলতায়, বিশাল সত্তায় ভরপুর হইয়াছে। বাল্মীকির

ক্ষত্রিয়ৌ বৃত্তসম্পন্নৌ বিদ্ধি নৌ বনগোচরৌ।

ত্বাং তু বেদিতুমিচ্ছাবঃ কস্ত্বং চরসি দণ্ডকান্॥

আর বৈদিক ঋষি শুনঃশেফের

অমী য ঋক্ষা নিহিতাস উচ্চা নক্তং দদৃশে কুহচিৎদিবেয়ুঃ।

অদব্ধানি বরুণস্য ব্রতানি বিচাকশৎ চন্দ্রমা নক্তমেতি॥

এ মহামন্ত্র শুনিতে শুনিতে শুনঃশেফেরই মত আমাদের অন্তরের সকল বন্ধন কি টুটিতে থাকে না—ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি? বোধ হয় বরুণদেব আমাদের মাথার উপর হইতে কি একটা আবরণ সরাইয়া দিয়াছেন, কোথা হইতে একটা বিপুল স্রোত মুক্তি পাইয়া আমাদের প্রাণের দুই কূল ছাপাইয়া চলিয়াছে। ফলত এই বরুণই হইতেছেন ঋষিত্বের কবিত্বের মূল প্রতিষ্ঠা। বৈদিক গাথায় তিনটি দেবতাকে আমরা সর্ব্বদা একসঙ্গে দেখিতে পাই, তিনজনে মিলিয়া তাঁহাদের সমবেত শক্তি দিয়া মানুষকে জগৎকে উন্নতির সিদ্ধির পথে লইয়া চলিয়াছেন। এই ত্রয়ীর নাম বরুণ মিত্র অর্য্যমা। বরুণ হইতেছেন যাহা অনন্ত অসীম, যাহা বৃহৎ, যাহা ভূমা—অল্পের বিপরীত, অর্থাৎ মুক্তি। মিত্র হইতেছেন সম্মিলন সামঞ্জস্য সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য। আর, অর্য্যমা হইতেছেন সামর্থ্য বীর্য্য শক্তি। কবিত্ব-প্রতিভারও মধ্যে এই তিনটি দেবতা যুগপৎ আছেন। কিন্তু আগে বরুণ, তিনিই প্রতিষ্ঠা, তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে মিত্র ও অর্য্যমা—মুক্তির অসীম বিস্তারে, দিব্যদৃষ্টির উদার

অকুণ্ঠিত প্রসারে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে শক্তির মনোহর ছন্দোবদ্ধ অঙ্গভঙ্গ।

তাই কবিত্বের প্রথম কথা হইতেছে সকল রকম সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হওয়া। কবি খুঁজিবেন বিশ্বভাব, বিশ্ববাক্—এমন ভাব যাহা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মানুষ মাত্রই অনুভব করে বা করিতে পারে, এমন বাক্ যাহা সকলের মুখে কেমন আপনার ভাষারূপে সহজে ফুটিয়া উঠে। এ কথা সত্য—কবিও মানুষ, আর প্রত্যেক মানুষের আছে ব্যক্তিগত জাতিগত বিশেষত্ব। আচারব্যবহার রীতিনীতি শিক্ষাদীক্ষা অর্থাৎ কাব্যের উপকরণ সব যেখান হইতে সংগৃহীত হয় সে-সব ভিন্ন দেশে ভিন্ন কালে ভিন্ন রকম। প্রত্যেক ভাষারও আছে আবার নিজস্ব ভঙ্গী, বিশেষ বিশেষত্ব। কবিকে এই সকল জিনিষ লইয়াই কাব্য রচনা করিতে হয়। কোন বিশেষ জাতি নয় এইরূপ একটা বিশ্বমানব বলিয়া বাস্তবজগতে কোন পদার্থ নাই। বিশেষ ভাষা নয়, এ রকম বিশ্বভাষাও স্থূল জগতে কিছু নাই। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না। কবির কবিত্বই ত ঠিক এইখানে—বিশেষের মধ্যে কি করিয়া বিশ্বকে দেখান যায়, যাহা দেশে কালে আবদ্ধ এমন জিনিষকে কি করিয়া অনন্তের শাশ্বতের প্রতীক করিয়া ধরা যায়, অল্পের মধ্যে ভূমার অভিব্যঞ্জনা কিরূপে ফুটাইয়া তোলা যায়। কবি একদিকে যেমন সাময়িক সত্যকে, ক্ষুদ্র জনপদের মধ্যে আবদ্ধ সত্যকে একান্ত করিয়া ধরিবেন না, সেই রকম যে সত্য আবার দেশকালপাত্রের কোন সংস্পর্শে আসিতে চায় না অর্থাৎ যাহা হইতেছে একান্ত দার্শনিক তথ্য, তাহার দিকেও ঝুঁকিয়া পড়া তাঁহার উচিত নয়। ফলত, শুধু অশরীরী, বাস্তবতার ছায়া স্পর্শ করিতে চায় না বা পারে না যে সার্ব্বভৌমিকতা—তাহা হইতেছে বিশেষভাবে দার্শনিকের কথা। দার্শনিকের সত্য local colourকে কেবলই এড়াইয়া চলিতে চায়, কারণ সত্যকে রঙাইয়া ফলাইয়া দেখান তাঁহার উদ্দেশ্য

নহে। কিন্তু কবি চাহেন সত্যের জাগ্রতমূর্ত্তি—মূর্ত্তি থাকিবে, আর মূর্ত্তি যাহা তাহা একটা সীমার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইবেই, অথচ ইহারই মধ্যে বিশ্বকে ধরিয়া দিতে হইবে, অসীমকেই জীবন্ত প্রাণবন্ত গোচর চক্ষুগ্রাহ্য করিয়া প্রকটিত করিতে হইবে—ইহাই কবির কর্ম্মসু কৌশলম্।

এই যেমন ভর্জ্জিল যখন বলিতেছেন

Tantae molis erat Romanam condere gentem—

তখন বাহ্যত পাই একটা বিশেষ জাতির জাতীয় অভিমানের কথা, রোম নামক কোথাও একটি নগরের প্রতিষ্ঠাকল্পে যে বাধাবিপত্তি ঘটিয়াছিল, যে প্রয়াস করিতে হইয়াছিল তাহার কথা। কথার অর্থে এখানে বিশ্ব বলিয়া কিছু পাই না, কিন্তু কবি ঐ কথাগুলি এমন ভাবে এমন ভঙ্গিমায় বলিয়াছেন যে আমাদের মনে হয় এখানে রোমনগরীর কথা হইতেছে না, জাতিপ্রতিষ্ঠার কি বাধাবিপত্তি তাহারও বিবরণ কিছু দেওয়া হইতেছে না। এ-সব আমরা একেবারেই ভুলিয়া যাই, দেখি যেন চোখের সম্মুখে বিশ্বের সম্মুখে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে কি একটা জগৎজোড়া বিশাল বিপুল প্রয়াসপুঞ্জ। রোম, দেবী জুনো, এনেয়াস এ-সকল যেন ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্বমানবের কি একটা নিগূঢ় মহাসত্যকে ফুটাইয়া ধরিবার ইঙ্গিত, আশ্রয়—excuse মাত্র।

সেই রকম দান্তের মহাকাব্যে, মিল্‌তনের মহাকাব্যে যে বিষয় বর্ণিত হইয়াছে সেটা বিশেষভাবে খৃস্টিয়ানী কথা। আমরা আধুনিক যাহারা বুদ্ধিবাদী জড়বিজ্ঞানসেবী আমাদের প্রাণে এই দুই কবির অনেক কথাই কেমন অদ্ভুত, শুধু অদ্ভুত নয় কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে—অন্তত কেমন অপরিচিত, দূর-দূর ঠেকিবে। কিন্তু কথাকে ছাড়াইয়া যখন যাই ভাবের মধ্যে, উপকরণ ছাড়াইয়া যখন প্রবেশ করি অন্তরাত্মার উপলব্ধির মধ্যে, তখন পাই আর-এক জিনিষ, কি এক উদার আমাদের অতি-আপনারই বস্তু। কবি যতই কেন বিদেশীয় বিজাতীয় নামে ও রূপে

ভরপুর করিয়া বলুন না

> Jehovah thundering out of Sion, throned
> Between the Cherubim—

তিনি যতই জটিল বা গুহ্য সঙ্কেত ও রূপকে আপনাকে ঢাকুন না

> উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ

তবুও আমরা শুনি, অনুভব করি কবির সেই কথা যাহা নাম-রূপের উপরে, যাহাই হইতেছে কবির মর্ম্মবাণী—

> Above the Olympian hill I soar,
> Above the flight of Pegasian wing !
> The meaning, not the name. I call.

কবি যিনি তিনি বিশেষ দেশের ও বিশেষ কালের অতীত। দেশ ও কালকে তাই বলিয়া তিনি যে অগ্রাহ্য করেন তাহা নয়। দেশ ও কালকে আশ্রয় করিয়া, তাহার মধ্যে থাকিয়া, তাহাদের দেওয়া মালমশলা লইয়া একটা সকল দেশের সকল কালেব চিরন্তন অসীম জিনিষকে—বিশ্ব-সাহিত্যকে স্থষ্টি করেন। অন্যপক্ষে যে রকম সাহিত্য একান্ত দেশে ও কালে আবদ্ধ, বিশেষ নামে ও রূপের মধ্যেই যাহার সব ব্যঞ্জনা শেষ হইয়া গিয়াছে, যাহার মধ্যে সমগ্রের বিশ্বের হাওয়া মুক্তভাবে বহিবার অবকাশ পায় নাই, তাহার নাম সাহিত্য দিলেও দিতে পার—কিন্তু সেটি বিশ্বসাহিত্য নয়, তাহা হইতেছে গ্রাম্যসাহিত্য।

২

সকল দেশেরই সাহিত্যের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই দুইটি স্বর, দুইটি ধারা। মানুষের যেমন আছে একটা প্রাকৃত জীবন আর একটা অধ্যাত্ম জীবন, কোন সাহিত্যের মধ্যেও ঠিক তেমনি আছে একটা প্রাকৃত সাহিত্য আর একটা সাধু সাহিত্য। প্রাকৃত, স্থূল বা বাহিরের জীবন

হইতেছে প্রতিষ্ঠা, উহাই জোগাইতেছে উপকরণ সব; কিন্তু মানুষের কর্ত্তব্য, তাহার সার্থকতা হইতেছে এই প্রাকৃত প্রতিষ্ঠার উপর ভর করাইয়া অধ্যাত্মেরই চূড়াটি গড়িয়া তোলা, প্রাকৃত উপকরণরাজীকে অধ্যাত্মেরই ভাবে ব্যঞ্জনায় সাজাইয়া ধরা। সেই রকম সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা, গোড়ার ভিত্তি প্রাকৃত সাহিত্য হইলেও, প্রকৃত সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে ঐ প্রাকৃতকে বদলাইয়া আর-একটা উচ্চতর প্রতিষ্ঠানের মহত্তর ভাবে ভঙ্গিমায় গড়িয়া তোলার মধ্যে। এখন এই প্রাকৃত বা গ্রাম্য সাহিত্য জিনিষটি কি? এই জিনিষটিরই অপর নাম হইতেছে লোকসাহিত্য অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তাহার সাধারণ জীবনকে ঘিরিয়া প্রতিফলিত করিয়া যে সাহিত্য সৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে। মানুষের যখন শৈশব, সবেমাত্র সে যখন পশু হইতে পৃথক হইয়া আপনাকে চিনিতে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে, কেবলমাত্র যখন তাহার মুখে বাক্ ফুটিয়াছে, তখন ভাবকে অনুভবকে বাক্যের মধ্যে দুলাইয়া তুলিতে যে আনন্দ তাহা হইতেই উদ্ভূত এই প্রথম প্রাকৃত কবি। এখানে পাই সহজ সুলভ অনুভূতির সহজ সুলভ উচ্ছ্বাস। কবি এখানে একেবারে স্থূলদৃষ্টি, তাঁহার চক্ষু চলে কেবল বাহিরের দিকেই—আর সে বাহিরেরও সীমা হইতেছে তাঁহার কাছে কাছে, ঠিক যাহা যতটুকু দেখা যায়। কবি তাঁহার কুটীরে বসিয়া, ঘর-গৃহস্থালির কাজকর্ম্ম করিয়া, গ্রামের ক্ষেতখানির মধ্যে বেড়াইয়া যে নিত্যনৈমিত্তিক সহজদৃষ্ট হাবভাব বা ঘটনাদি লক্ষ্য করেন তাহাই কথায় ও সুরে ভরিয়া তুলেন। তাঁহার কল্পনাও আবদ্ধ এই সকল বা এই সকলের অনুরূপ জিনিষের মধ্যে। তাঁহার ভাষা সরল, তরল, অর্দ্ধস্ফুট—কেমন ভাসিয়া চলিয়াছে, গলিয়া পড়িতেছে; তাঁহার ভাব অতিসুলভ হাসিকান্না লইয়া, তাঁহার অর্থের মধ্যেও কঠিন কিছু নাই। ছড়া, রূপকথা এইসব হইতেছে মানুষের সাহিত্যসৃজনের প্রথম প্রয়াস। তারপর আসে আর-এক যুগ

যখন মানুষ কেবল কথা বলাতেই আনন্দ পায় না, কিন্তু কথা বলিতে চায় সুন্দর ভাবে, একটা স্বরূপ পরাইয়া দিয়া। শুধু তাই নয়, যে-সে কথা সে কহিতে চায় না, চায় একটা কহিবার মত কথা। এইখানেই প্রকৃত সাহিত্যের গোড়ার পত্তন; কিন্তু তবুও সেখানে মিশিয়া আছে প্রাকৃত স্তরের ভঙ্গী, গ্রাম্যতার আভাস। প্রকৃত শিল্পীকবির আছে যে একটি অধ্যাত্মসত্তা, একটা নিভৃত রসোপলব্ধি, একটা উদার বিশ্ব-অনুভূতি—তাহা তখনও দেখা দেয় নাই। নিজের চারি পাশ, নিজের গ্রামখানিকে তিনি ছাড়াইয়া গিয়াছেন, তিনি আবার অন্য দেশ বা অন্য কালের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতেও পারিয়াছেন বোধ হয়, এমন কি সকল মানুষের কথাও বোধ হয় তিনি বলিতে পারিয়াছেন, কিন্তু তবুও আছে এক সঙ্কীর্ণতার আবছায়া, শিশুর মুখে বড় বড় কথা বলিবার চেষ্টার মত। এখানে চয়ন নাই, বাঁধন নাই, গঠন নাই, গুরুত্ব নাই—প্রাকৃত জীবনের মতনই তাহা অপর্য্যাপ্ত স্তূপীকৃত বিশৃঙ্খল শিথিল, তাহারই মত বেশীর ভাগই স্থূলের দিকে বাহিরের দিকে অল্পের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া। ইংলণ্ডের ব্যালাড কবিতা, ফরাসীর রোমান্স গীত এই স্তরের। আর আমাদের কীর্ত্তন, আউলের বাউলের গান—বিষয় তাহাদের যতই গভীর বা আধ্যাত্মিক অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ক হউক না কেন—কবিতা শিল্প বা আর্ট হিসাবে তাহাও ঐ একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যে যেদিন চসারের আবির্ভাব হইল, যেদিন শুনিলাম তাঁহার প্রিয় ইতালীয় কবি পেত্রার্কা সম্বন্ধে তিনি এমন কথা বলিতে পারিয়াছেন যে এ কবির মধুর বাণী (whose rethorik swete)

Enlumynd Ytaille of Poetrie

সেদিন ইংরেজি কবিতা পাইল কি এক নূতন প্রাণ, নূতন সুর। ইংলণ্ডের কাব্যগগনও যেন কি এক নবীন আলোকেই উদ্ভাসিত হইয়া

উঠিল। চসার ইংরেজি সাহিত্যকে প্রাকৃত স্তর হইতে উঠাইয়া ধরিলেন অধ্যাত্মের স্তরে, তাঁহা হইতেই Great Poetryর জন্ম। প্রাকৃত কবির মধ্যে যে একটা স্থূলহস্তের অবলেপ আছে, যে একটা সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যতাদোষ আছে, তাহা কাটাইয়া কবি এখানে এক উর্দ্ধতর উদারতর জ্যোতির্ময় বিপুল প্রতিষ্ঠানকে দেখিয়াছেন, সৃজন করিয়াছেন। ফরাসীতেও তাহার সকল Romans, সকল Chansons de Gestes, এমন কি তাহার Chansons de Roland পর্য্যন্তও রহিয়া গিয়াছে এই প্রাকৃত ভাব। প্রকৃত কবিতার—যাহা মহৎ, যাহা সত্ত্ববান—তাহার জন্ম দেন প্রথম রঁসার (Ronsard)।

এখানেও তবু কবিতা তাহার স্বরূপ পায় নাই—তাহাকে আরও এক স্তরে উঠিতে হইয়াছে, এই তৃতীয় ধাপটি পার হইয়া যাইতে হইয়াছে এক তুরীয় লোকে, যেখানে কবিতা প্রাকৃতের গ্রাম্য ভাবের সকল ছায়া অতিক্রম করিয়াছে, যেখানে কবিতা বাস্তবিকই বিশাল বিপুল, যেখানে সে পাইয়াছে বৃহৎ সত্তা, ভিক্তর হিউগোর সেই immensité. এইখানেই কবি পাইয়াছেন দিব্য এক তপঃশক্তি যাহা চায় সত্যকে সাক্ষাৎ দেখিতে, বাক্যে ছন্দে মূর্ত্ত করিয়া মহৎ করিয়া ধরিতে ; যাহা কিছু সরল সুলভ সহজ তরল তাহাকে সংহত নিরেট ওজঃপূর্ণ করিয়া তুলিতে ; অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্যকে কাটিয়া ছাঁটিয়া, জিনিষের যথা-বিন্যাস করিয়া—যোগ্যং যোজ্যেন যোজয়েৎ—নিকটকে দূরের, সঙ্কীর্ণকে বৃহতের আভায় ভরপুর করিয়া ধরিতে—দেশ-কালের অনুভূতিকে সকল দেশের সকল কালের অনুভূতির মধ্যে জাজ্বল্যমান করিয়া ধরিতে। এই চতুর্থ স্তরেই সাহিত্যের Great manner বিকশিত হইয়াছে। চসারের Enlumyad all Ytaille of Poetrie -কে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে

মার্লোর

Is this the face that launched a thousand ships
And burnt the topless towers of Ilium ?

মার্লো যাঁহার মধ্যে প্রথম শুনিতে পাই মিল্‌তনের সে অপূর্ব্ব সাগর-সঙ্গীত, বরুণেরই অসীম মুক্তির ছন্দ—সেই bruit de tous les infinis—সকল অসীমের সমবেত ডাক। তাই রঁসার (Ronsard)-এর পরে আসিয়াছেন Malherbe, যিনি ফরাসীতে ক্লাসিক সাহিত্যের স্রষ্টা, যিনি মহাকবি কর্ণেই'র জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

ক্লাসিক রীতির দিকে সাহিত্যের এই যে একটি স্বাভাবিক টান আছে তাহাই সাহিত্যের প্রাণের কথা। প্রাকৃত ভঙ্গিমা হইতে যত দূরে পারা যায়, যাহা বাহিরের, ঠিক চারি দিকের, যাহা সহজ সাধারণ, তাহা হইতে যত পৃথক করিয়া পারা যায় সেই রকম এক আভিজাত্যের সাহিত্য-সৃষ্টি কিছু না করিলে কোন জাতির সাহিত্য-প্রতিভা যেন পূর্ণমাত্রায় আপন শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারে না। কারণ, সাহিত্যের চরম লক্ষ্য জীবনকে, অর্থাৎ দৈনন্দিন নিত্যনৈমিত্তিক চিরপরিচিত জীবনকে, অনুকরণ করাও নয়, প্রতিফলিত করাও নয়—ভাব ও ভঙ্গী হিসাবেও নয়, বস্তু ও বিষয় হিসাবেও নয়। সে চায় ভিতরের সুদূরের সমুচ্চের আর-একটা জগতের, এক মহাজীবনের হিসাবনিকাশ দেখাইতে, সেজন্য এ জীবনের আশ্রয় লইতে হয়, এটির মধ্য দিয়াই সেটিকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়, কিন্তু আশ্রয় হিসাবে, আধার বা প্রণালী হিসাবে মাত্র। এ কথা সত্য, Classicism বলিয়া যে জিনিষটির সহিত আমরা পরিচিত তাহাকে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলা যায় না। কারণ আসল আর নকল জিনিষ এক নয়। মিল্‌তন ও পোপ, অথবা কর্ণেই ও দেলিল (Delille) একই হিসাবে ক্লাসিক নহেন। আমরা বলিব পোপ ও দেলিল মোটেই ক্লাসিক নহেন—যদি হন তবে বলিতে পারি তাঁহারা

ক্লাসিক নয় তাঁহারা হইতেছেন ক্লাসিকাল (Classical)। মিল্‌তন ও কর্ণেই সাহিত্যের যে ধারাকে ব্যক্ত করিয়াছেন, পোপ ও দেলিল সেই ধারাতেই চলিয়াছেন, কিন্তু চলিয়া গিয়াছেন মাত্রা অতিক্রম করিয়া। এই যে অতিমাত্রা, এই যে বিকৃতি, ইহার দোষের কথা আমরা পরে বলিব কিন্তু তবুও ইহা কি সাহিত্যের অতি নিগূঢ় এক সত্য-প্রকৃতিকেই লক্ষ্য করিতেছে না ?

আমাদের বঙ্গসাহিত্যে প্রাকৃতকে ছাড়াইয়া উঠিয়া প্রকৃত কবিতা স্বজনের প্রথম প্রয়াস হইতেছে বিগ্যাপতি, চণ্ডীদাস। লোকসাহিত্যের, পল্লী বা গ্রাম সাহিত্যের প্রাণে একটা নূতন তার, নূতন সুর যোগ করিয়া ইঁহারাই যথার্থ কবিতার ভিত্তি গাঁথিয়া গিয়াছেন। বিগ্যাপতি যখন বলিয়াছেন

শুন মাধব ! রাধা স্বাধীনা ভেল

অথবা যখন শুনি চণ্ডীদাসের

হিয়ায় রাখিব কারে না কহিব
পরাণে পরাণ যোড়া

তখন যে রস আমাদের প্রাণকে রসাইয়া তুলে তাহা বিশুদ্ধ কবিতাই দিতে পারে। বলা হয়, সংস্কৃতে বাল্মীকিই আদি কবি, কিন্তু আমাদের বঙ্গভাষায় বিদ্যাপতি অথবা আরও ঠিক ঠিক বলিতে গেলে চণ্ডীদাসই হইতেছেন এই আদি কবি যিনি সর্ব্বপ্রথম প্রাণের সহজ অনুভূতিকে অন্তরাত্মার উপলব্ধির মধ্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন, মুখের কথাকে একটা নিবিড়তর ছন্দে ভঙ্গীতে গড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু এটি আরম্ভ মাত্র, ইহার পরিণতি, পূর্ণ পুষ্টি হইতে সময় লাগিয়াছে। ইহা হইতেছে আমরা যে তৃতীয় স্তরের কথা বলিয়াছি সেই স্তরের। সমস্ত বৈষ্ণব যুগ ধরিয়া, এমন কি ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত, এই স্তরেরই সাধনা চলিয়াছে। চণ্ডীদাসের পর এই সকল কবি যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা খুব একটা

নূতন কিছু করেন নাই, নূতন অর্থাৎ বঙ্গীয় কবি-প্রতিভার অন্তরাত্মার আর-এক পর্দ্দা কিছু উদ্ঘাটন করেন নাই—তাঁহারা যাহা করিয়াছেন সেটা বাহিরের একটা মাজাঘষা, বা নূতন বিন্যাস। এই যুগের সাহিত্য প্রাকৃতকে ছাড়াইয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়াছে, পারিয়াছেও বটে, কিন্তু তবুও মোটের উপর সেখানে কেমন একটা অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। সেখানে পাই না—ম্যাথু আর্নল্ডের কথায়, a humanity variously and fully developed—অথবা আমরা যেমন বলিয়াছি বিশ্বজীবনের বৈচিত্র্যেভরা এক উন্মুক্ত অবকাশ।

এই জিনিষটি, অল্পের একটা গণ্ডীর মধ্যে যে গতিবিধি তাহাকে ভাঙ্গিয়া এই বৃহতের কোলে সম্প্রসারণ, বঙ্গসাহিত্য পাইয়াছে ইংরেজি যুগে—মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথে। বঙ্কিম যেদিন কপালকুণ্ডলাকে সৃষ্টি করিলেন, মধুসূদনের লেখনীতে যেদিন বাহির হইল

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে—

যেদিন রবীন্দ্রনাথ বলিতে পারিলেন

নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী—

সেদিন বঙ্গ-সরস্বতীর কণ্ঠে যে স্বর বাহির হইল তাহা একান্ত বঙ্গেরই নহে তাহা বিশ্ব-সরস্বতীরই বাণী, বাঙ্গলাকে ছাড়িয়া সমগ্র জগতের মধ্যে বঙ্গ-প্রতিভা তাহার আসনখানি করিয়া লইল—বাঙ্গলা কবিতা পাইল কবিতার সেই চতুর্থ বা শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।

তবুও প্রশ্ন হইতে পারে, মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সত্ত্বেও বঙ্গসাহিত্যে এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীরও যে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তাহা হইয়াছে কি না। যে সাহিত্য বাস্তবিকই ক্লাসিক (সেন্ট্‌ ব্যভের Littérature vraiment classique), যাহা সত্য সত্যই সকল দেশের সকল যুগের

প্রাণে অগ্নিবর্ণে লিখিত থাকিবে, এমন মহামন্ত্রের সাহিত্য বঙ্গভাষায় আছে কি না, থাকিলে কয়খানি আছে? আমাদের মনে হয়, একেবারেই নাই এ কথা বলা যায় না। আছে, কিন্তু খুবই অল্প, বঙ্গসাহিত্য তাহাকে তেমন স্ফুট জাগ্রত তেমন আপনার করিয়া লইতে পারে নাই; সেটা নিয়ম নয়, বেশীর ভাগ যেন কেবল নিয়মের ব্যভিচার। পৃথিবীর মহাকণ্ঠ কবিদিগের (voices majores) সম্পর্কে আসিয়া বাঙ্গলার কবিপ্রাণ দুলিয়া উঠিয়াছে বটে, সেখানে ভিতরে ভিতরে ভাবে ইঙ্গিতে গৌণত একটা মহাপ্রাণের সাড়া পাই বটে কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাহা কথা কহিতে পারে নাই, আধার এখনও যেন নিরেট হইয়া গড়িয়া উঠে নাই, তাহার ঠিক চারিদিকের আবহাওয়ায় কি একটা জিনিষ যেন রহিয়াছে যাহা তাহাকে নীচের দিকে, প্রাকৃতের দিকে টানিয়া রাখিয়াছে।

৩

আমরা যাহাকে গ্রাম্য বা প্রাকৃত সাহিত্য বলিয়াছি তাহা যে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রূপটি দিতে পারে না তার কারণ আরও একটু তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিব। কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি এই যে, সে রকম সাহিত্য বিশেষ দেশে ও কালের মধ্যেই একান্ত আবদ্ধ, বিশ্বের হাওয়া, উদার উন্মুক্ত জীবনের বহুল তরঙ্গ তাহার মধ্যে খেলিয়া যায় নাই, সৃষ্টিকে মানুষকে তাহা সমগ্র বিশ্বের মধ্যে ধরিয়া দেখে নাই। এইজন্য বটে, কিন্তু ইহাই সব নয়, অথবা ইহার আছে একটু গভীরের অর্থ, সেটি ভাল করিয়া বুঝা প্রয়োজন। কারণ, বিশ্বভাব মানে Cosmopolitanism নহে। সকল দেশের সকল যুগের সাথে মিলামিশা পরিচয়াদি থাকিলেই যে সাহিত্য মহনীয় হইয়া উঠিবে, আর না থাকিলেই যে গ্রাম্য হইয়া পড়িবে এমন কোন কথা নাই। Cosmopolitanism

জিনিষটি বিশেষভাবে আধুনিক যুগের কথা। আধুনিক কালে সকল দেশের সকল জাতির মধ্যে যতখানি আদান-প্রদান ও ঘনিষ্ঠতা সম্ভব হইয়াছে পূর্ব্বে তাহা কিছুই ছিল না। আধুনিক আমরা প্রাচীনতর যুগ প্রাচীনতর সভ্যতা-সকলের কথা যত জানিয়াছি, যত আপনার করিয়া লইতে পারিয়াছি, আমাদের পিতৃপুরুষদিগের পক্ষে সে রকম কিছু সম্ভব ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীনদিগের সাহিত্য গ্রাম্য বা নগণ্য এমন কথা কে সাহস করিয়া বলিবে? তুর্গেনিয়েভ, আমিয়েল, লেকন্ত দ'লীল, অথবা আরও ঠিক ঠিক বলিতে গেলে পিয়ের লোতি, আধুনিক যুগেই জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। দান্তে, হোমর, বাল্মীকি, বা প্রাচীনতম বৈদিক ঋষিগণ, কেহই ইঁহাদের মত দেশের দেশের যুগের যুগের বার্ত্তা খুঁজিয়া বেড়ান নাই, অথচ তাঁহারা যে বিশ্বসাহিত্যকে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহার অনুরূপ কিছুও কি আধুনিকগণ দিতে পারিয়াছেন?

বিশ্বভাব অর্থ দেশ ও কালের বন্ধন অতিক্রম করা। এখন, মানুষ যে দেশে ও কালে আবদ্ধ তার মূল কারণ এই যে সে এমন একটি বৃত্তি, ধর্ম্ম বা প্রতিষ্ঠানকে ধরিয়া বসিয়াছে যাহার স্বভাবই হইতেছে দেশ ও কালের মধ্যে খণ্ডিত হইয়া থাকা। বাহিরের জীবন, জগতের সাথে মিলামিশা, নানা দেশের নানা যুগের অনুভূতি উপলব্ধির সহিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা এই সঙ্কীর্ণতাকে ভাঙ্গিয়া অনেকখানি তরল করিয়া আনিতে পারে কিন্তু একেবারে দূর করিতে পারে না, সেজন্য চাই নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করা, ভিতরের কিছু পরিবর্ত্তন করা। এই ভিতরের ভাব যে পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই, সে যদি সমস্ত ভূমণ্ডল চষিয়াও বেড়ায় তবুও প্রকৃত সার্ব্বভৌমিকতা বা বিশ্বভাব সে বেশী কিছু পাইবে না। সুতরাং চাই বাহিরে নয়, অন্তরেই বিশ্বসত্তাকে পাওয়া। আর সেজন্য কাটাইতে হইবে তিনটি বন্ধন, পার হইয়া যাইতে হইবে তিনটি দেওয়াল—তাহাও ভিতরের, অন্তরেরই।

ঋষি শুনঃশেফ যেমন বলিয়াছেন বরুণদেবের আছে তিনটি পাশ, এই তিনটি পাশ কাটিয়া ফেলিতে হইবে, তবেই মানুষ উঠিয়া যাইবে বরুণের অনন্ত প্রসারে, সে পাইবে জীবনের যে অসীম অগাধ রসসাগর। এই তিনটি বন্ধন কি? তাহা হইতেছে দেহের বন্ধন, প্রাণের বন্ধন, মনের বন্ধন। কবির সাহিত্যিকের পক্ষেও আছে এই একই রকম তিন বন্ধন। প্রথম দেহের বন্ধন অর্থাৎ স্থূলদৃষ্টি, শুধু ইন্দ্রিয়-অনুভূতি—বাহিরটিকে, আকারকে, চোখে যাহা দেখা যায়, ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা স্পর্শ করা যায় তাহাকেই একান্ত সত্য বলিয়া ধরা, তাহারই আলেখ্যটুকু রচনা করা। সাহিত্যে ইহারই নাম দেওয়া হইয়াছে Realism বা বস্তুতান্ত্রিকতা। চর্ম্মচক্ষে যে জিনিষটি যেমন দেখা যায়, কেবল সেই জিনিষ সেই ভাবে দেখাইতে হইবে, অর্থাৎ শিল্প হইতেছে প্রকৃতির ফটোগ্রাফ, ইহাই বস্তুতান্ত্রিকের শিল্পসূত্র। বস্তুতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে যে-সব আপত্তি তোলা হইয়াছে বা হইতে পারে তাহা আমরা এই এক কথায় ব্যক্ত করিতে পারি যে উহা প্রকৃত সাহিত্য, বিশ্বসাহিত্যকে জন্ম দেয় নাই, দিতে পারে না। কারণ বিশ্বকে সমগ্রকে পাই কোথায়? তাহা বাহিরে নয়, দেহে নয়। একান্ত বাহির যেটি, যাহা শুধু দেহ, সেটি ভেদের দ্বন্দ্বের খণ্ডের সঙ্কীর্ণের ক্ষেত্র। বিশ্বের দেহগত মিলন বা সামঞ্জস্য একটা আছে। কিন্তু যতক্ষণ আমরা দেহেরই মধ্যে আবদ্ধ ততক্ষণ সে জিনিষটির খোঁজ কিছু পাইব না। ইহা সাধকের কথা, শিল্পীরও এই একই কথা। যে শিল্পী শুধু বাহির লইয়া আছেন, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বিশেষ দেশে, বিশেষ কালের মধ্যে আবদ্ধ হইতে হয়—সে শিল্পীর অপর নাম প্রত্নতাত্ত্বিক, তিনি শিল্পের মালমশলা জোগাইতেছেন বোধ হয়, কিন্তু কিছু গড়িয়া তুলিতে পারিতেছেন না। রবিবর্ম্মার চিত্র কোনদিন বিশ্বসভায় স্থান পাইবে না; কারণ সেখানে পাই শুধু খোলস, প্রাণ নাই, তাই সে খোলস কিম্ভূতকিমাকার বলিয়া অনেকের কৌতূহলটুকু উদ্রেক করিতে

পারে, কিন্তু হৃদয় কখন স্পর্শ করে না। জোলা (Zola) বা গঁকুর (Goncourt) যদি সে সভায় স্থান পান তবে বস্তুতান্ত্রিকতার জন্য নয়, বস্তুতান্ত্রিকতা সত্ত্বেও স্থূলের উপর জোর দিলেও, তাঁহারা স্থূল ছাড়া আর-একটা জিনিষের কিছু সন্ধান পাইয়াছেন যাহা বিশ্বের কিছু আপনার, কিছু নিকটতর।

তাই বস্তুতান্ত্রিকের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন ভাবতান্ত্রিক। দেহ নয় কিন্তু প্রাণের জীবনের চিত্তের হৃদয়ের আবেগেরই মধ্যে বিশ্বের মিলনভূমি। তাই Materialismএর বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে Vitalism, Realism বা Naturalismএর বিরুদ্ধে Idealism বা Romanticism—হীকেলের বিরুদ্ধে বের্গসন, মোপাসাঁ ও থেওফিল গোতিয়ে'র বিরুদ্ধে পল ভের্‌লেন। কিন্তু এই ভাবতান্ত্রিকতা, এই প্রাণ বা চিত্তাবেগকেও একান্ত করিয়া লইলে যে আমরা প্রকৃত বিশ্বসাহিত্য পাইব তাহা নয়। দেহের উপর প্রাণ বটে, প্রাণের মধ্যে সৃষ্টি অনেকখানি মুক্তি ও প্রসার পাইয়াছে কিন্তু এখানেও বিশ্বের মিলনস্থান নয়। প্রাণ হইতেছে মানুষের দ্বিতীয় বন্ধন। প্রাণ চিত্ত ও হৃদয়াবেগের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া যে কবিতা সৃষ্ট হইয়াছে তাহা আবিল উচ্ছৃঙ্খল, তাহার মধ্যেই পাই অতিমাত্র ব্যক্তিত্ব—মুদ্রাদোষ (Idiosyncrasy, fancy)। কাজেই তাহা বিশ্বের উদার প্রাণের কথা নয়। প্রাণাবেগের দাস যে কবি তিনি নিজের সাময়িক অনুভবের কল্পনার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকেন, তাঁহার অহংবৃত্তি—হৃদয়ের গ্রন্থি—যে সঙ্কীর্ণ দেশ ও কালটি ঘিরিয়া আছে সেইটিকে অতিকায় করিয়া দেখে। বিশ্ব তাঁহার সহিত প্রতিফলিত হইবার সুযোগ পায় না। তিনি বড়জোর একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের কবি হইয়া উঠেন।

তাই সাহিত্যে আর-একটা আদর্শ আমরা দেখিতে পাই, যাহা প্রাণের চিত্তের কুয়াসাকে ছাড়াইয়া দাঁড়াইতে চাহিয়াছে মন বুদ্ধিকে ভর করিয়া,

যাহা চাহিতেছে চিন্তার ধীর স্থির নির্ম্মলতা উদারতা। প্রাণের চিত্তাবেগের রাজ্যে যতখানি উচ্ছৃঙ্খলতা আবিলতা দ্বন্দ্ব সঙ্কীর্ণতা সম্ভব, চিন্তার রাজ্যে তাহা তত কিছু সম্ভব নয়। এই রাজ্যে উঠিয়া গেলে একটা উদাসীনতা অহমিকার অতিমাত্র-ব্যক্তিত্বের গণ্ডী কাটাইয়া স্থান পাই মুক্ততর আয়তনে। প্রাচীন সাহিত্যে—গ্রীক লাতিন সংস্কৃত সাহিত্যে যে এতখানি উদারতা বিশালতা সার্ব্বভৌমিকতা পাই তাহার কারণ কি ইহাই নয় যে সে সাহিত্যের মধ্যে রোমাণ্টিকের ভাববিলাসিতা, রাজসিক প্রেরণাব অস্মিতার তীব্র উগ্র সুতরাং ঘনীভূত সঙ্কুচিত একটা রাগ নাই—সে সাহিত্যের মূলকথা হইতেছে objective personality? অন্য কথায়, ক্লাসিকাল বা বুদ্ধিতন্ত্র সাহিত্য—Classicism কি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিগ্রহ নহে?

আমরা বলি, না। বুদ্ধি সাহিত্যের গায়ে একটা সাত্ত্বিকতা শান্তি প্রসাদগুণ লেপিয়া দিতে পাবে, তাহাকে বৈচিত্র্যপূর্ণও করিয়া ধরিতে পারে কিন্তু সে সাত্ত্বিকতা, সে শান্তি, সে প্রসাদগুণ, সে ধরণের উদারতাকে কেমন ফাঁপা অন্তঃসারশূন্য বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মাণ্ডসাগরের একটা ভাসা ভাসা উপর-উপরের বিস্ফারিত হাসি কিছু পাইতে পারি কিন্তু পাই না সাগরের প্রকৃত বিরাটত্ব, বিপুলত্ব, তাহার অনবধারণীয়তা —ইদৃক্তয়া ইয়াত্তয়া বা। শুধু চিন্তার, মস্তিষ্কের বিচারের, তর্কের সহায়ে সাহিত্য যে গড়া হয় তাহা আমরা যেমন পূর্ব্বেই বলিয়াছি ক্লাসিকাল হইতে পারে হউক, কিন্তু তাহা ক্লাসিক নয়, বিশ্বসাহিত্য নয়—তাহা বিশ্ব-সাহিত্যকে বিশ্বসৌন্দর্য্যকে ধরিয়া দেখাইতে পারে না। বিশ্বসাহিত্যের কাঠামোকে সে দিলেও দিতে পারে, কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের যে প্রাণ যে নিভৃত সত্তা তাহা দিতে পারে না। কারণ বুদ্ধির কাজ সাজাইয়া গুছাইয়া ধরা—আবিষ্কার করা নয়। ইন্দ্রিয়-পরিচয়, স্থূল প্রতীতি, চিত্তের অনুভব যে মশলা জোগাইতেছে বিচারবুদ্ধি তাহাকেই ধরিয়া আশ্রয় করিয়া

খেলিতেছে। সুতরাং স্থূল ইন্দ্রিয়ের চিত্তের যে খণ্ডতা যে অভাব যে ত্রুটি, বুদ্ধির কাজে তাহা মিশ্রিত থাকিবেই। তারপর বুদ্ধির ধর্ম্মই হইতেছে কাটিয়া ভাগ ভাগ করিয়া দেখা, বিশ্বকে সে দেখে বিশ্লেষণ করিয়া, সমস্তকে সে যুগপৎ দেখে না, একই বিশাল একত্বের মধ্যে ধরিতে পারে না। মোট কথা এই, বিচারবুদ্ধি হইতেছে—উপনিষদ যেমন বলিতেছেন, সত্যের মুখে হিরণ্ময় পাত্র, সত্যের স্বরূপকে সে দেখাইতে পারে না. সে যাহা দেখায় তাহা হইতেছে সত্যাভাস—সত্যের গৌণ প্রকাশ, বাহিরের চাকচিক্য, তাহার খণ্ডিত বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন রশ্মি। বুদ্ধির সহায়ে বিশ্বের সহিত একটা চলনসহি পরিচয় স্থাপন করিলেও করিতে পারি কিন্তু তাহা প্রকৃত মিলন নহে। Classicism তাই সুন্দর শোভন কথার, শিক্ষার উপদেশের ভাণ্ডার সহজেই হয় কিন্তু বস্তুর রহস্য, বিশ্বের সাথে নিগূঢ় একাত্মতা দেওয়া তাহার পক্ষে দুষ্কর। গ্রীক লাতিন সংস্কৃত বা ফরাসী সাহিত্যে যে classicism বা বুদ্ধিবৃত্তির মনীষায় স্থিতধীর অসামান্য প্রভাব দেখি এবং সেইজন্য বলি এই বৃত্তিই সেই সকলকে ক্লাসিক সাহিত্যরূপে গড়িয়া তুলিয়াছে—সে জিনিষটি বাহিরের কথা মাত্র। আর একটা গভীরতর বৃত্তি এই বুদ্ধিবৃত্তির পিছনে থাকিয়াই ইহাকে উদ্ভাসিত মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে—বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে আশ্রয় বা নিমিত্ত মাত্র।

দেহ প্রাণ মন বাহিরেরই জিনিষ। একান্ত যাহা দেহ, একান্ত যাহা প্রাণ, একান্ত যাহা মন তাহা হইতেছে প্রধানতই ভেদের সুতরাং সসীমের ক্ষেত্র। আত্মাই হইতেছে একমাত্র ভিতরের বস্তু, আত্মাই বিশ্বের কেন্দ্র। সৃষ্টির যে বৈচিত্র্য নানা বিশেষত্ব, আত্মার মধ্যেই তাহার একত্ব, বিপুল জমাট সামঞ্জস্য। আত্মাকে যদি ধরিতে পারি তবে সেইসঙ্গেই বিশ্বকেও সহজে অব্যর্থভাবে আলিঙ্গন করিতে পারিব—তস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্ব্বং বিজ্ঞাতম্। অর্থাৎ স্থূল ইন্দ্রিয়ানুভূতি নয়,

ভাবাবেগ নয়, চিন্তাকৌশলও নয়—বিশ্বসাহিত্যের জন্য চাই দিব্যদৃষ্টি। বিশ্বসাহিত্য Realistic নহে, Romantic নহে, Classicalও নহে, বিশ্বসাহিত্য হইতেছে Revelatory. Revelation বা দিব্যদৃষ্টির মধ্য দিয়া যখন বিশেষ জিনিষকে দেখি তখন সে জিনিষ আর বিশেষ থাকে না, তাহা হইয়া উঠে সমগ্র; দেশ কাল পাত্র তখন হইয়া উঠে অসীমের শাসনের সমস্তেরই বিগ্রহ—কারণ দিব্যদৃষ্টিই দিতে পারে সত্যের সত্য যে মহাসত্য, সৌন্দর্য্যেরও সৌন্দর্য্য যে মহাসৌন্দর্য্য।

দেহের, স্থূল ইন্দ্রিয়-অনুভূতির মধ্যেও আছে এক মহা সত্য, মহা সৌন্দর্য্য, এক বিশ্বমূর্ত্তি; প্রাণের চিত্তের অনুভবের মধ্যেও আছে আর-এক বিশ্বভাব। মনের বুদ্ধির বিচারের মধ্যে প্রতিফলিত হয় বিশ্বের আর-এক বিভূতি। কিন্তু সে বিশ্বদ্যোতনা দেহের প্রাণের মনের নিজস্ব ধর্ম্ম নহে—সেটি হইতেছে এই এই ক্ষেত্রে আত্মার ছায়া বা আবির্ভাব। বিশ্বসাহিত্যের জন্য দেহকে প্রাণকে মনকে—দেশ ও কালকে যে অগ্রাহ্য করিতে হইবে তাহা নয় কিন্তু সে-সকলকে দেখিতে হইবে এক তুরীয় স্তর হইতে। এইজন্যই কালিদাস দৈহিক আনন্দ ইন্দ্রিয়বিলাসের কবি হইয়া, বাল্মীকি হৃদয়ের ভাববিমুগ্ধতার কবি হইয়া, আর বেদব্যাস চিন্তাশক্তির কবি হইয়াই সকল দেশের সকল যুগের কবি।

আমরা প্রাকৃত ও প্রকৃত সাহিত্যের কথা বলিতেছিলাম। একমাত্র প্রকৃত সাহিত্য তাহাই যাহা জিনিষকে—যে জিনিষই হউক না কেন—জিনিষকে দেখিতেছে—স্পিনোজার মহাবাক্যে—sub specie aeternitatis—অনন্তের ভাব দিয়া। প্রকৃত বা বিশ্ব সাহিত্যের ইহাই মূলকথা; sub specie aeternitatis—এই জিনিষটি যেখানে পাই সেখানে স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ। বাল্‌জাক যে Realism-কে আশ্রয় করিয়াছেন তাহার মধ্যে, ভিক্তর হিউগোর Roman-

ticismএর মধ্যে, লেকন্ত দ'লীল (Leconte de Lisle)-এর মধ্যে এই জিনিষেরই কিছু আভাস পাই, তাই সকল দোষ সকল ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা অনুভব করি ইঁহাদের মধ্যে সুপ্ত ব্রহ্ম যেন জাগিয়া উঠিয়াছেন, বিশ্বের কি এক প্রাণ তাঁহাদের সৃষ্টির মধ্যে খেলিতেছে; তাই বিশ্বের কবি বলিয়া ইঁহাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিতে আমাদের দ্বিধা হয় না।

কোন বিশেষ জাতির সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা। মাওরিদের বা সাঁওতাল-ভীলদের মধ্যে খুঁজিলে যে সুন্দর প্রাণস্পর্শী গাথা পাওয়া যায় না এমন নয়; অসভ্য জাতির কথা ছাড়িয়া দিয়া সুসভ্য শিক্ষিত জাতির সাহিত্যের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই পাই এক রকম উচ্চশ্রেণীরই সাহিত্য, কিন্তু সে সাহিত্য বিশ্বসাহিত্য কি না, যদিও হয় তবে কতখানি, এ প্রশ্ন করিবার আছে। জিজ্ঞাসা করিবার আছে, বাস্তব-যাথার্থ্য ভাববিমুগ্ধতা চিন্তাচাতুরী পার হইয়া অন্তরাত্মা, ভাগবত কাব্যপুরুষের, বরুণদেবের দেশকালপাত্রাতীত বিপুল মহাদৃষ্টির ভিতর দিয়া—sub specie aeternitatis—বস্তুকে ভাবকে চিন্তাকে, দেশকে কালকে পাত্রকে কবি দেখিতে পারিয়াছেন কি না, সৃজন করিতে পারিয়াছেন কি না—প্রাকৃতকে অতিপ্রাকৃতের মধ্যে তুলিয়া ধরিতে পারিয়াছেন কি না।

প্রবাসী : বৈশাখ, ১৩২৬

মিস্‌টিক কবি

আধুনিক কালে এক শ্রেণীর কাব্যকে Mystic School নাম দেওয়া হইতেছে। সুতরাং বলা বাহুল্য একটা কিছু সাধারণ গুণ বা ধর্ম্ম এই সম্প্রদায়ের কবিদের মধ্যে লোকে লক্ষ্য করিয়াছে, এবং সেইজন্যই এই সাধারণ নামটি দিয়াছে। এখন, সে জিনিষটি কি? ইংরাজি 'মিস্‌টিক' কথার অর্থ গুহ্য, রহস্যপূর্ণ—যাহা অপরিচিত, দূরে দূরে, সহজ সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায় না, নিত্যনৈমিত্তিক অনুভূতি-উপলব্ধির মধ্যে ধরা যায় না। ফলত দেখি এই মিস্‌টিক কবিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে আধ্যাত্মিক বিষয়, ভিতরের অন্তরাত্মার কথা। স্থূলজগতের কর্ম্মজীবনের দিকে ইঁহারা দৃষ্টি দেন নাই, সাধারণ মানুষের সহজলক্ষ্য নিত্যপরিচিত ভাবের বৃত্তির প্রেরণার ঘাত-প্রতিঘাত কিছু দেখান নাই, মানুষ তাহার মানবীয় প্রকৃতি লইয়া কি করিতে চায় সেটি তাঁহারা বিবেচনাযোগ্য মনে করেন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছেন সূক্ষ্মজগতের কথা, ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখী গতিকে টানিয়া ফিরাইয়া তাঁহারা অতীন্দ্রিয়ের দিকে চালাইয়া দিয়াছেন; মানুষের সহিত প্রকৃতির সহিত তাঁহারা অশরীরী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে চাহিতেছেন আত্মাকে আত্মার ভিতর দিয়া, মানুষকে ভগবানের ভিতর দিয়া—ইহকে অমুত্রের আভায়, সান্তকে অনন্তের দ্যোতনায়।

সুতরাং এমন জিনিষকে, সাধারণ মানুষের কাছে যাহা কঠিন, দুর্ব্বোধ্য, গুহ্য, তাহাকে যে মিস্‌টিক নাম দেওয়া হইবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক। কারণ মানুষের পরিচয় বিশেষভাবে এই জগতের, স্থূলের, দেহের সঙ্গে। তারপর অধ্যাত্মের কথা; সূক্ষ্মজগতের, ভাবলোকের

বিষয় প্রাচ্যে যতখানি সাধারণের সম্পত্তি, ইউরোপে তেমন নয়। ইউরোপে যে এ রকম কাব্যকে মিস্‌টিক বা রহস্যজনক বলিবে তাহা আশ্চর্য্যের নয়। ইউরোপ বেশীর ভাগ চিনে, জানে কর্ম্মজগতের কথা, ইহের এপারের যে সমস্ত অনুভব উপলব্ধি—ইউরোপের যাঁহারা শ্রেষ্ঠ মনীষী কবি তাঁহারা এই সকলকেই ফলাইয়া দেখাইয়াছেন; মানুষের সহিত আর-এক জগতের সম্বন্ধের কথা তাঁহাদের মধ্যে খুব অল্প লোকে এবং অল্পই বলিয়াছেন। তাই না পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্য চিরদিন the Mystic Orient এই নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছে!

সুতরাং দেখা যাইতেছে Mysticism হইতেছে যাহা Realism, বাস্তবিকতা—তাহার বিপরীত। বাস্তব কথাটি এখানে একটু ব্যাপক অর্থেই লইতে হইবে। বাস্তব কেবল তাহাই নয় যাহা একেবারে জড় বা স্থূল। প্রাণের আবেগ, মনের ভাব, বুদ্ধির চিন্তা—এ-সব জিনিষ সকলেরই সুপরিচিত, সাধারণ মানুষ ইহাদিগকেও বাস্তব বলিয়াই জানে, অনুভব করে। একিলিসের শৌর্য্য, রোমিও-জুলিয়েতের প্রেম, ইয়াগোর ঈর্ষা, রোদরিগের (Rodrigue) মর্য্যাদাভিমান, অথবা হোরাসের (Horace) স্বদেশপ্রীতি, নিসুস-ইউরিয়লের (Nisus and Euryalus) বন্ধুত্ব, রামের পিতৃভক্তি, সাবিত্রীর পাতিব্রত্য—এ সকলই মানুষের সাধারণ বৃত্তি, এ সকলই হইতেছে এ জগতের, ইহমুখী। ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, ওপারের কিছু নাই, তাই বাস্তব—অর্থাৎ মিস্‌টিক নয়। শুধু মানুষকে কেন, সৃষ্টিকে প্রকৃতিকেও এই বাস্তবতার দিক হইতে দেখা যাইতে পারে; খোলা চোখে সহজ ভাবে সকলে যেমন দেখে। শেক্সপীয়রের 'the floor of heaven inlaid with patines of bright gold', কালিদাসের 'ভাগীরথী নির্ঝরশীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ' খুব স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, সাধারণ কথাই কি নয়? এখানে দুর্লক্ষ্য প্রহেলিকা কিছু নাই, বাহিরের ছাপটি চোখের পর্দার

উপর যেমন পড়িয়াছে তাহারই আলেখ্যখানি। ওপারের, ঠিক চোখে যাহা দেখা যায় না, এমন বাস্তবের অতীত জিনিষ কিছু পাই না—ইহা Realismই।

কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, ভগবৎ-কথা হইলেই যে তাহা মিস্‌টিক হইবে এমনও নয়। কারণ, ধর্ম্ম ভগবান সম্বন্ধে কতকগুলি মোটা ভাব সকল মানুষেরই মধ্যে আছে। মানুষের অন্যান্য সাধারণ বৃত্তির ন্যায় এটিকেও একটি সাধারণ বৃত্তি বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। পরলোকে বিশ্বাস, ভগবানে ভক্তি, দেবদেবী বা অদৃশ্য শক্তির পূজা, এ-সকল কোন-না-কোন রকমে মানবপ্রকৃতির অতি পরিচিত বিষয়। এ-সকল জিনিষ মানুষমাত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে চিনে, জানে, অনুভব করে। ইহাদের মধ্যেও সূক্ষ্ম কিছু নাই, অতীন্দ্রিয় আর-এক জগতের রহস্য কিছু নাই—এ-সকল এ জগতেরই কথা, তবে একটু উপরের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া চাওয়া মাত্র। 'হে ভগবান তুমি আছ, আমায় উদ্ধার কর'—ইহা সহজ প্রাণের সুলভ উচ্ছ্বাস। যে ভাব লইয়া, যে স্তরে দাঁড়াইয়া আমরা বলি

আছ অনল অনিলে চির নভোনীলে
ভূধর সলিল গহনে,

প্রায় সেই একই ভাব, একই স্তর হইতে আমরা আবার বলি

রাত পোহাল ফরসা হল
ফুটল কত ফুল—

উভয়ই স্পষ্ট সাধারণ সর্ব্বজন-অনুভব্য কথা। উভয়েই এ জগতের, প্রাকৃতের, প্রত্যক্ষের—পার্থক্য শুধু এইটুকু, এক স্থানে উহার মধ্যেই ডুবিয়া মজিয়া আছি, আর-এক স্থানে দৃষ্টি একটু উপরের বা ভিতরের দিকে দিয়াছি; কিন্তু প্রতিষ্ঠা একই, অনুভূতির ধরণটি একই। এ জগৎকে ছাড়িয়া দিই নাই, আর-একটি লোকে উঠিয়া তবে এ-জগৎকে ও-জগৎকে সৃষ্টিকে দেখি নাই।

অন্যদিকে, তত্ত্বকথা দার্শনিক তথ্য হইলেই যে অধ্যাত্ম বা মিস্‌টিক হইবে তাহাও নয়। কারণ, দার্শনিক রহস্যকে মানেন না, তাঁহার কাজই হইতেছে বুদ্ধির কাছে তাহাকে সরল সহজ সুস্পষ্ট করিয়া ধরা। বিচারের লজিকের মানদণ্ডে সকলকে কাটিয়া ছাঁটিয়া সাজাইয়া তিনি দেখেন। যেমন হইয়াছে বা হইতে পারে, এ জগতের যেমন ধরণধারণ, ঠিক সেই রকমেই সত্যকে উপস্থিত করেন—ইহারই নাম প্রমাণ। অঘটন, অত্যাশ্চর্য্যকে স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে না বসাইয়া দিতে পারিলে তাঁহার স্বস্তি নাই। ফলত, দার্শনিক বৃত্তি বা শুদ্ধ বিচারবুদ্ধি যাহা জড়বস্তুকে জড় হিসাবেই দেখিতে চায় না, যাহা চায় বস্তুর ভিতরের সাধারণ অবস্তু (abstract), তাহা বাস্তবিকতারই উল্টা দিক, তাহা চলিতেছে খেলিতেছে বাস্তবিকতা—Realismকেই ঘিরিয়া। দর্শনও বস্তুতন্ত্র, তাহা মিস্‌টিক নয়। কাণ্টই পড়ি বা শঙ্করই পড়ি—তাহা যতই কেন আর-এক জগতের—noumenonএর, ব্রহ্মের কথায় ভরপুর হউক না, মনে হয় সে-সকলে এ জগতেরই ছাপ লাগিয়া আছে। খুব নূতন, খুব অপ্রত্যাশিত—গুহ্য কিছু—সেখানে পাই না। যে সহজ বুদ্ধির বলে বুঝিতেছি ওথেলোর হৃদয় কি রকমে ক্রমে ক্রমে ভীষণ গরলে ভরিয়া উঠিল, সে গরলে অব্যর্থভাবে কেমন করিয়া মরিল দেসদিমোনা, ঠিক সেই সহজ বুদ্ধিকে আর-একটু শাণিত করিয়া লইলেই বুঝিব, ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা—এ কথার মানে কি। শঙ্কর অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন, শেক্সপীয়র প্রাকৃত প্রাণের একটা স্থূল প্রবৃত্তির কথা বলিয়াছেন—কিন্তু দুইই এক ধরণে, অর্থাৎ দুয়েরই ধরণ (method) Realism, তাহা Mysticism নহে। কালিদাসের মত তুমি বল

শ্রোণিভারাদলসগমনা

আর শঙ্করেরই মত বল

জলং পঙ্কবদত্যন্তং পঙ্কাপায়ে জলং স্ফুটম্।
যথাভাতি তথাত্মাপি দোষাভাবে স্ফুটপ্রভঃ॥

এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে উভয়েরই মধ্যে পাই এক ভাব—স্ফুট করিয়া সাধারণের অনুভূতির সহিত মিলাইয়া ধরার প্রয়াস। প্রথমটি তুমি আমি সকলেই বুঝি, অনায়াসে ধরিতে পারি; দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক কথা হইলেও আমরা সকলেই সেই একই রকমে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তা আমরা যতই প্রাকৃতজন হই না কেন।

Mysticism আর-এক জগতের কথা, সত্য বটে—কিন্তু ততখানি আর-এক জগতের কথা নয় যতখানি আর-এক জগতের ভঙ্গিমায় কথা বলা। রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিকতার ওপারের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ভের্‌লেন (Verlaine) বলিয়াছেন বিশেষভাবে এ জগতেরই অনুভূতির কথা, অথচ ভের্‌লেন হইতেছেন মিস্‌টিকদিগের রাজা। অন্য কথায়, Mysticism জিনিষটি ঠিক ঠিক এক মতবাদ নয়, মূলত এটি হইতেছে একটা ভাব, প্রাণের এক রকম ধাত, দেখিবার এক ভঙ্গী। ইহা নির্ভর করে মানুষের প্রকৃতির স্বভাবের এক বিশেষ গড়নের উপর। সে গড়নটি কি?

মানুষের মধ্যে আছে দুইটি বৃত্তি, দুইটি টান। এই দুইটিই আছে যুগপৎ, দুইটিই প্রবল—তবে যেটি যাহার মধ্যে প্রবলতর হইয়া উঠে, যেটির উপর যাহার সত্তা কিছু ঝুঁকিয়া পড়ে, সেইটির রঙে ভঙ্গিমায় তাঁহার সকল দৃষ্টি সৃষ্টি রঙ্গিয়া গড়িয়া উঠে। একটি হইতেছে অনন্তের দিকে টান, আর-একটি সান্তের দিকে; একটি ওপারের দিকে, আর-একটি এপারের দিকে। যে দিকটা মানুষের খোলা, সান্তকে এপারকে চাহিয়া, তাহা লইয়াই মানুষ Positivist, Realist—বস্তুতন্ত্র; আর যেদিকে চাহিয়া রহিয়াছে অনন্তের ওপারের উদ্দেশে, তাহা লইয়াই সে

Idealist বা মিস্‌টিক। সান্তের ভাবে প্রণোদিত হইয়া সে চায়, যে জিনিষ জানিতে হইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া জানিতে, যে জিনিষ ধরিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে ধরিয়া রাখিতে। তাহার জগৎটি হইবে সুসীম, একটা যথানির্দ্দিষ্ট রেখার ঘের উহাকে বেড়িয়া থাকিবে; শক্ত, নিরেট, নড়চড় হয় না এমন স্থানই তাহার বাসভূমি; যে জিনিষপত্র লইয়া তাহার কারবার তাহাও তরল বাষ্পীয় কিছু হইবে না, নিজের হাতের মুঠির মধ্যে সকল জিনিষ সে পুরিয়া রাখিতে চায়। যাহা কিছু ক্ষীণ মলিন অস্পষ্ট ছায়াময়, যাহা কিছুর মধ্যে সন্দেহ দ্বিধা অনিশ্চয়তার লেশমাত্র দেখা যায় সে সকলে তাহার তুষ্টি নাই। সে ভালবাসে মধ্যাহ্নের দীপ্ত ছটা। ইহাই হইতেছে মানুষের মধ্যে আছে যে Positivist বা বস্তুতান্ত্রিক। অন্যপক্ষে তাহার ভিতরে আছে যে অনন্তের ভাব, সে নিথর স্থির স্থাণু কিছু চায় না, সে সর্ব্বদাই চায় গতি, সীমাকে সে চলে অতিক্রম করিয়া, তাহার চক্ষু পড়িয়া আছে যাহা দেখা যায় না তাহার প্রতি, তাহার হাত দুখানি প্রসারিত যাহাকে ধরা যায় না এমন জিনিষের উদ্দেশে। তাহার অভিজ্ঞা, তাহার পরিচিত ক্ষেত্রটির চারিধার সে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে; তাহার জগতের কোন বেড়া নাই, তাহার দিক্‌চক্রবাল সরিয়া সরিয়া ক্রমে ছায়াময় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে—মিশিয়া মিলাইয়া অ-জানার অ-পাওয়ার ওপারে। জিনিষকে বড় কাছে কাছে রাখিলে, তাহার সব জানিয়া বুঝিয়া ফেলিলে, একটা বিশেষ বিগ্রহের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া ধরিলে, তাহার সৌন্দর্য্য রহস্য রোমান্স কিছু থাকে না—তাই সে রাখে দূরে দূরে, সম্মুখে একটা ঝিলিমিলি টানিয়া দিয়া। মানুষের মধ্যে মিস্‌টিক যে, তাহার কাছে মধ্যাহ্নের তপন বড় রূঢ় রুক্ষ—সে ভালবাসে গোধূলির আলোছায়া-মিশ্রণ।

তাই বলিয়া মিস্‌টিক যে কল্পনার মায়া-রচনার দাস, তিনি যে সত্যকে সাক্ষাৎ দেখেন না, উপলব্ধি করেন না, এমনও নয়। মিস্‌টিকের

অনুভূতির, সৃষ্টির মধ্যে সে রকম একটা আভাস পাই বটে, যেন কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া, কুয়াশায় ঘেরা, সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অভাব—সত্যকে তিনি যেন ধরিতে পারেন নাই, সেইদিকে উন্মুখ হইয়া আছেন, এখনও অন্ধকারেই হাতড়াইতেছেন আর অনুমানে তাঁর মনগড়া একটা প্রতিবিম্ব কিছু সৃজন করিতেছেন। কিন্তু ঠিক তাহা নয়। এ রকম যে আপাততঃ বোধ হয় তাহার একটা গভীর কারণ আছে। মিস্‌টিক সত্যকে সাক্ষাৎ দেখিতে, উপলব্ধি করিতে পারেন, কিন্তু সে সাক্ষাৎ দৃষ্টিকে তিনি চোখে দেখার ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে চাহেন না। সত্যের মধ্যে, বস্তুর অন্তরাত্মায়, তাহার নিগূঢ় সৌন্দর্য্যে আছে যে একটা অনন্তের ভাব তাহা যে অনির্ব্বচনীয় ; তাহাকে স্থূলের প্রকাশের মানুষের এই খণ্ডিত অসম্পূর্ণ সঙ্কীর্ণ মালমসলায় ঢালিয়া গড়িলে সে অনির্ব্বচনীয়ত্ব যে সবই নষ্ট হইবে, সত্য উপলব্ধির বিরুদ্ধাচরণই করা হইবে। তাই বাক্য বল, ছন্দ বল, রং বল, রেখা বল—এ সকলকে তাহাদের স্থূল জগতের কাটাছাঁটা ধরাবাঁধা গড়নে রচিলে চলিবে না। অসীমকে অনন্তকে যথাযথ দেখাইতে হইলে সীমার সান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে বটে, কিন্তু সে সীমার সান্তের মুখ খুলিয়া রাখিতে হইবে, তাহাদের উপর যত অল্প জোর দেওয়া যায় তাহাই করিতে হইবে। ইহাই হইতেছে মিস্‌টিকের শিল্পসূত্র। মিস্‌টিক যে তাঁহার সত্যের উপলব্ধিকে একটু হেঁয়ালির ছন্দে প্রকাশ করেন, একটা পাতলা অবগুণ্ঠনের মধ্যে ধরিয়া দেখান, তাহা তিনি ইচ্ছা করিয়াই করেন, অথবা আরও ঠিক করিয়া বলিতে গেলে, ভিতরের এই ভাব, এই প্রয়োজনের টানেই করেন যে, অনন্তকে অব্যক্তকে অনন্তের অব্যক্তের মতন করিয়াই লোকের সম্মুখে ধরিতে হইবে—নতুবা সে অনন্তের উপলব্ধির সার্থকতা কি ?

প্রাচীন কবিতার ও আধুনিক কবিতার পার্থক্যও ঠিক এইখানে। প্রাচীন কবিগণ বিশেষভাবে এ-জগতেরই কর্ম্মজীবনের কথা বলিয়াছেন,

সত্য বটে; কিন্তু তাঁহারা এ-জগতের কথাই বলুন, আর ও-জগতের কথাই বলুন, যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছেন এ-জগতের কাঠামো ও ভঙ্গী দিয়া, এইটিই হইতেছে তাঁহাদের প্রধান বিশেষত্ব—এ-জগতের স্থূলের ভঙ্গিমা অর্থাৎ বুদ্ধি যে ভঙ্গিমা চিনে, গড়ে। বের্গসন দেখাইয়াছেন স্থূলে জড়ে যে বিন্যাস, যে শৃঙ্খলা, যে অতিনির্দ্দিষ্ট অতিস্পষ্ট কাটাছাঁটা ভঙ্গী সেটি হইতেছে বিচারবুদ্ধিরই দান। বিচারবুদ্ধিই জগতের কর্ম্ম-জীবনের বস্তুকে এমন সীমায় সীমায় সুসীম করিয়া ধরিয়াছে, তাহাকে এমন অঙ্গে অঙ্গে বাঁধা ও নিরেট, হাতের মধ্যে রাখিবার ব্যবহার করিবার যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত জগৎ, জীবন, জগতের জীবনের সত্য নিগূঢ় সত্য যাহা তাহা সে রকম কিছু নয়—তাহা চির-চঞ্চল; বিশেষ সীমা, সুস্পষ্ট রেখা, একটা আরম্ভ ও একটা শেষ সেখানে কিছু নাই; একটির মধ্যে আর-একটি ঢলিয়া গলিয়া চলিয়াছে। প্রাচীন কবিগণ কিন্তু এ ভাবে জগৎকে দেখেন নাই; বুদ্ধির কাছে স্ফুট করিয়া ধরিবার জন্য, বুদ্ধির কাঠামোর মধ্যেই তাঁহাদের অনুভূতি উপলব্ধিকে গড়িয়া সাজাইয়া দেখাইয়াছেন। ক্লাসিক সাহিত্য এই ভঙ্গিমার চরম পরিণতি। ইহার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন যাঁহারা তাঁহাদেরই নাম রোমাণ্টিক কবি। জগৎ-সত্যের মধ্যে আছে যে একটা নিরবচ্ছিন্ন গতি, একটা চঞ্চল একটানা প্রবাহ, আলো-আঁধারের মিশামিশি লইয়া যে একটা অনির্দ্দেশ্যের অসীমের অখণ্ডের অনির্ব্বচনীয় অভিব্যঞ্জনা, রোমাণ্টিকগণ কাব্যরচনায় তাহারই কিছু প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবুও রোমাণ্টিকগণ ক্লাসিক সাহিত্যের প্রভাব একেবারে এড়াইতে পারেন নাই। ক্লাসিকগণের মত বস্তু-জগতের উপর একান্ত জোর না দিলেও, তাঁহারা সেইদিকেই অনেকখানি হেলিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা কর্ম্মজীবনের কথা তেমন বলেন নাই, তাঁহারা বলিয়াছেন প্রাণের ভাবের অনুভব, তাঁহারা

দিয়াছেন প্রাণজগতেরই দোলায়িত গতি, স্বপ্নলোকের আবেশ; তবুও সে প্রাণের ভাবুকতা খেলিয়াছে এ জগতের উপরই ভর করিয়া, তাঁহাদের স্বপ্নরচনা এই জাগ্রতেরই শৃঙ্খলাকে অনেকখানি মানিয়া লইয়াছে। রোমান্টিকও বস্তুতান্ত্রিকেরই আর-এক মূর্ত্তি।

মিস্‌টিক কবি রোমান্টিকের শেষ পরিণতি। জড়জগতের, এপারের ওজন-করা বস্তু আর কাটাছাঁটা ধরণধারণ সব তিনি বদলাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। তাই তিনি চাহেন তত্ত্বের কথা, ভাবের ভঙ্গিমা। বুদ্ধি দিয়া বুঝা, স্ফুট জাগ্রত করিয়া ধরা তাঁহার ধাতুতে নাই; তিনি অন্তরাত্মা দিয়া অন্তরাত্মার বস্তুকে অনুভব করেন, অশরীরীকে ইঙ্গিতের সাহায্যে লক্ষ্য করেন মাত্র। জগৎ, সৃষ্টি, প্রকাশ, রূপ যাহা, মিস্‌টিকের কাছে তাহার নিজস্ব মূল্য তেমন নাই। এ-সব হইতেছে একটা গভীরতর বিরাটতর সত্তার পরিচ্ছদ, আবরণ; এ সকলকে শুধু সঙ্কেত, রূপক বা সিম্বল হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এ. ই. (A.E.) যেমন বলিয়াছেন, এ-সব 'Veils of Maya', 'Vesture of the Soul'—ইহাদেরও নিজের একটা সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য ততখানি সুন্দর, যতখানি তাহা প্রতিফলিত করিতেছে ভিতরের অনির্ব্বচনীয় অনির্দ্দেশ্য সৌন্দর্য্যকে। এপারের যাহা কিছু মনোলোভা তাহা যে ওপারেরই ক্ষীণ ছায়া। সেই ওপারের প্রতি চাহিয়াই কবি গাহিয়াছেন

> আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে
> ভাষাবিহীন অজানিতের গানে,
> সকাল সাঁঝে পরাণ মম টানে
> কাহার বাঁশী এমন গভীর স্বরে! —গীতাঞ্জলি

এই ওপারকে চক্ষু মেলিয়া দেখিবে কে? কে তাহার স্বরূপটি রূপের মধ্যে ধরিয়া গাঁথিয়া পরিপূর্ণ প্রকট করিবে? অবাঙ্‌মনসগোচর

যাহা তাহা বাক্যের চিন্তার রেখায় সবখানি প্রকাশ করিয়া ফেলিবে কে? অন্তত মিস্‌টিক যিনি তিনি তাহা করেন নাই এবং তাহা যে সম্ভব এমনও বিশ্বাস করেন না। মিস্‌টিক[১] যেন চক্ষু মুদিয়া বাক্‌ সংযত করিয়া ভিতরে ভিতরে হৃদয়ের সহিত হৃদয় সংযুক্ত করিতেছেন, প্রাণ দিয়া প্রাণকে স্পর্শ করিতেছেন—তাঁহার কর্ত্তব্য জানা নয়, বোধ করা। বোধের অনুভবের মধ্যেই ত সব, জানিলে ত ফুরাইয়া গেল, অজানার মধ্যেই সব রহস্য, সব সৌন্দর্য্য। এই অজানার মধ্যেই আবার সত্য; কারণ জানা যাহা, তাহা সত্যের একটা দিক, একটা বিচ্ছিন্ন অঙ্গ বা ছায়া মাত্র। অজানার অসীম অনন্ত প্রসারেই পূর্ণ সত্য।

মিস্‌টিক কবি জিনিষের রূপ দেখেন না, এমন্‌ কি জিনিষের অর্থও বুঝেন না, তিনি অনুভব করেন জিনিষের ভাব। উপনিষদ বলিয়াছেন, সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—প্রশান্ত অবিক্ষুব্ধ সৎ-এর মধ্যে প্রাণশক্তি যখন ঢেউ খেলিয়া উঠে তখনই বস্তু সব রূপ ধরিয়া বাহির হয়। মিস্‌টিক ঠিক বস্তুর সৃষ্টির প্রাক্কালের এই প্রাণের প্রথম তরঙ্গভঙ্গটি অনুভব করেন, দেখাইতে চাহেন—ইহাই বস্তুর ভাব, ইহারই মধ্যে ডুবিয়া লুকাইয়া আছে বস্তুর অর্থ ও রূপ। এইখানেই পাই বস্তুর নিগূঢ় জীবনসত্য, এইখানেই অনন্তের অসীমের সহিত তাহার একাত্ম মিলন। ইহাই বস্তুর ওপারের ভাগবত সত্তা ও সৌন্দর্য্য, এইটিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মিস্‌টিক কবিকে বলিতে হইতেছে

ডুব দিয়ে এই প্রাণসাগরে
নিতেছি প্রাণ বক্ষ ভরে
আমায় ঘিরে আকাশ ফিরে
বাতাস বহে যায়। —গীতাঞ্জলি

১ Mystic কথাটি গ্রীক muein=চক্ষু মুদ্রিত করা, নির্ব্বাক হইয়া থাকা—হইতে আসিয়াছে, এমন কেহ কেহ বলিতেছেন।

ঠিক এইজন্যই মিস্‌টিক কবি সঙ্গীতের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন —এমন কি ভের্‌লেন কাব্যের মধ্যে শুধু সঙ্গীতই চাহিয়াছেন, সঙ্গীতই কাব্য[২]। কারণ সঙ্গীতের মধ্যে পাই সেই একেবারে অস্পষ্ট না হইলেও কেমন অনির্দ্দেশ্য ভাব, সেই 'প্রাণ এজতি'। সঙ্গীতের ধর্ম্মই হইতেছে বিশেষের, অতিস্ফুটের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা নয়, কিন্তু একটা সুবিস্তৃতের বাঁধনহীনের দিকে, কেমন এক গতির মাদকতার দিকে উধাও হইয়া চলিতে থাকা। বাক্যের অর্থের যে কাঠিন্য, যে সসীম রেখা, সঙ্গীত তাহাকে ক্রমাগত ভাঙ্গিয়াই চলিতে চাহিতেছে। তাই দেখি মিস্‌টিক চিত্রকর রেখার উপর জোর দেন নাই, তিনি জোর দিয়াছেন রংএর উপর। বাস্তবিক ভাবের যে খেলা তাহা রংএরই খেলা, তাহাতে বুদ্ধির দেওয়া কাটাছাঁটা রেখা যেন সব মুছিয়া মিলাইয়া যাইতেছে—এ যেন চিত্ত-সাগরের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে যে আলো-ছায়া, জাগিয়া উঠিতেছে যে একটা আবেশ। সঙ্গীতও এই ভাবের রংএরই খেলা—তাহার উদ্দেশ্য একটা সাধারণ, খুব ঠিক করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না এমন একটা জিনিষ কিছু উদ্রেক করা।

ইহাই মিস্‌টিকদিগের কথা—Blake ও Verlaine এই হিসাবেই খাঁটি মিস্‌টিক। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উঠে, এই রকম মিস্‌টিক কাব্যই কাব্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কি না, মানুষের পূর্ণ তৃপ্তি ইহাতেই হয় কি না! কাব্যের

[২] Paul Verlaine কাব্যরচনার যে সূত্র দিয়াছেন তাহাতে আমরা যে রকম মিস্‌টিক কাব্যের ব্যাখ্যা দিতেছি তাহারই স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন—

> De la musique encore et toujours!
> Que ton vers soit la chose envolée,
> Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée
> Vers d'autres cieux et d'autres amours.

চাই সঙ্গীত, শুধুই সঙ্গীত। তোমার কবিতা যেন হয় উড়িয়া-যাওয়া জিনিষটি, মনে হওয়া চাই অন্তরাত্মা যেন ছুটিয়া চলিয়াছে আর-এক রকম সব স্বর্গের দিকে, যেখানে আছে আর-এক রকম সব ভালবাসা।

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কি না তাহা বলা কঠিন, কিন্তু একমাত্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যে নয় তাহা নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে—এমন কি মিস্‌টিক কবিতারও অন্য মূর্ত্তি অন্য ধরণ থাকিতে পারে ও আছে, এমনও আমরা বলিতে পারি। আর মানুষের তৃপ্তির কথা যদি ধরা যায়, তবে আমাদের বোধ হয় এই শেষোক্ত ধরণেই মানুষের পূর্ণতর তৃপ্তি।

মানুষের তৃপ্তি কোথায়? উহা হইতেছে পাওয়ার মধ্যে, ধরার মধ্যে। মিস্‌টিক—অর্থাৎ যে Mysticismএর ব্যাখ্যা আমরা দিয়াছি, যাহা প্রতিফলিত হইয়াছে Symbolism, Impressionismএর মধ্যে—সে মিস্‌টিক চাহিতেছেন না-পাওয়া না-ধরার জিনিষ; অতৃপ্তিই তাঁহার সৃষ্টির গোড়ায়, অথবা বলিতে পার অতৃপ্তির মধ্যে যে তৃপ্তি। কারণ তৃপ্তি অর্থে নিঃশেষ হওয়া, ফুরাইয়া যাওয়া; তৃপ্তি সম্ভব সসীম সঙ্কীর্ণ ইহের স্থূল জগতের জিনিষে—মিস্‌টিক ঠিক যে তাহাই চান না, বস্তু-তান্ত্রিক বা বুদ্ধিতান্ত্রিকদের সঙ্গে এইখানেই ত তাঁহার সকল দ্বন্দ্ব। কিন্তু কথাটি এই, জিনিষকে পাইলে, ধরিলে, জানিলেই যে তাহা খাটো হয়, ফুরাইয়া যায়, এমন সর্ব্বত্র ঘটিতে বাধ্য নয়। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে, ব্রহ্মই হইয়া যাইতে হইবে—ভগবানকে পাইতেই হইবে, ধরিতেই হইবে—কিন্তু তাহাতে ব্রহ্ম খাটো হয় না, ভগবানও ফুরাইয়া যায় না। সিদ্ধির অর্থই তৃপ্তি; অতৃপ্তির যে সৌন্দর্য্য সার্থকতা তাহা সাধনার পথে। সিদ্ধির স্থিতি সাধনার গতি অপেক্ষা কি বড় নয়? প্রকৃতপক্ষে বেশীর ভাগ মিস্‌টিক কবিদিগের মধ্যে পাই মধ্যপথের কথা, চলার মুখে যে উপলব্ধি বা অনুভূতি ফুটিয়া উঠিতেছে—তাই ইহাদের সৃষ্টির মধ্যে একটা সন্দেহ, অধৈর্য্য, অস্পষ্টতা, ঘোরালো কিছু মিশিয়া থাকে। দূর হইতে একটা অজানা নূতন জগতের সন্ধান পাইয়াছেন, কি এক নূতন উপলব্ধি তাঁহাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে—সে সম্বন্ধে নির্ভীকভাবে জোর করিয়া কিছু তাই বলিতে পারিতেছেন না,

আভাসে ইঙ্গিতে সন্তর্পণের সহিত উপস্থিত ধারণাগুলি ব্যক্ত করিতেছেন। এ কথা সত্য, অনন্তকে অসীমকে সূক্ষ্মকে একান্তভাবে জানা, ধরা, পাওয়া যায় না—একটা কিছু না-জানার, না-ধরার, না-পাওয়ার ভাব চরম উপলব্ধির সাথে থাকেই। কিন্তু তাহা হইতেছে এই চরম উপলব্ধির, সিদ্ধির—জানার ধরার পাওয়ার—পরের কথা। উপনিষদ যেমন বলিয়াছেন, তাঁহাকে জানি এ কথাও যেমন বলিতে পারি না, তেমন জানি না এমন কথাও মুখে আনিতে পারি না। ফলত এখানে দুই রকম না-পাওয়ার না-ধরার প্রভেদটি বুঝিতে হইবে। এক হইতেছে যখন পাইতে ধরিতে পারিতেছি না তখন যে না-পাওয়ার না-ধরার অনুভব হয়, তখন পাইতে ধরিতে চাই না বলিয়া যে একটা অভিমান বা ভাণ বা সেই রকম একটা কিছু করি। মিস্‌টিকগণের মধ্যে এই দিকটাই যেন বিশেষ প্রবল। আর-এক রকম হইতেছে যখন পাইয়াছি ধরিয়াছি তখন সেই পাওয়ার ধরার জন্যই যে অনুভব করি উপলব্ধি করি এক না-পাওয়ার না-ধরার অসীম অবকাশ।

সে যাহা হউক, এ কথাও যদি স্বীকার করি মিস্‌টিকগণ সমুচ্চের প্রতি শুধু আকাঙ্ক্ষা নয় কিন্তু তার পূর্ণ উপলব্ধি দিয়াই সৃজন করিয়াছেন, তবুও সে উপলব্ধি হইতেছে ভাবগত। কিন্তু আর-এক উপলব্ধি আছে যাহা জোর দিয়া দাঁড়াইয়াছে জ্ঞানের উপর। একজন যদি আদি-প্রাণের গতিতে, সঙ্গীতে, বর্ণে তাঁহার আলেখ্যখানি চিত্রিত করিয়া থাকেন, আর-একজন করিয়াছেন এই প্রাণের পিছনে বা অন্তরে আছে যে চিন্ময় সৎ-বস্তু তাহারই স্থৈর্য্যে, স্থাপত্যে, রেখায়। ভাবের ধর্ম্ম যদি হয় উধাও হইয়া চলা, সব মিলাইয়া মিশাইয়া ছায়াময় করিয়া তোলা, জ্ঞানের ধর্ম্ম হইতেছে টানিয়া ধরা, সুসীম, সুস্পষ্ট করিয়া তোলা। আমরা বলি, অন্যান্য কলার যে ধর্ম্ম যে ভঙ্গীতেই সার্থকতা থাকুক না কেন, কাব্যের সার্থকতা এই শেষোক্ত ধরণে। কারণ, বাক্য সুতরাং অর্থ হইতেছে

কাব্যের মূল উপাদান, প্রতিষ্ঠা। অনন্তের অসীমের সূক্ষ্মের কথা যদি বলি তবে তাহাদিগকেও প্রকাশ করিতে হইবে বাক্যের নিটোল নিথরতায়, অর্থের পরিপূর্ণ রেখাসমূহতে। শুধু কথা এই, এই যে জ্ঞান তাহা বিচারবুদ্ধি-জাত নয়। এই যে বাক্য, অর্থ তাহা বাহিরের অনুভূতির প্রতিলিপিমাত্র নয়। এই জ্ঞান যে বিশেষ রূপ, বিশেষ নাম দেয়, সুস্পষ্ট উপলব্ধির যে সুসংহত সুবিন্যস্ত আকার দেয়, তাহা অনন্তেরই আপনার নাম-রূপ, তুরীয়েরই নিজের আকার। বুদ্ধির কাটাছাঁটা রূপ, স্থূলের ধরাবাঁধা গড়ন যে দেখি তাহা একটা সমুচ্চের নিগূঢ়ের রূপ ও গড়নেরই ছায়া মাত্র। এই ওপারের রূপ ও গড়নের মধ্যে এপারের রূপ ও গড়নের সঙ্কীর্ণতা, খণ্ডতা নাই; তাহার মধ্যে আসিয়া ধরা দিয়াছে, তাহারই জোরে ফুটিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে যাহা অনন্ত অসীম অবাঙ্‌মনসগোচরম্‌।

আমাদের মতে, এই জ্ঞানপন্থীরাই আরও বড় মিস্‌টিক। এ.ই., ইট্‌স্‌ অধ্যাত্মজগতের, ওপারেরই রহস্যের কথা বলিয়াছেন—কিন্তু তাঁহারা ঠিক চক্ষু মুদিয়া ভাবের আবেশে মুগ্ধ হইয়া সত্যকে সৌন্দর্য্যকে আলিঙ্গন করেন নাই, তাঁহারা যেন স্থির নেত্রে চাহিয়া দেখিয়াছেন সত্যের সৌন্দর্য্যের তেজোময় বিগ্রহ—জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে। শুধু আভাসে ইঙ্গিতে দূর হইতে তাঁহারা অনন্তকে নিগূঢ়কে দেখাইয়া দিতেছেন না—কিন্তু অনন্তকে নিগূঢকে সাক্ষাৎ পাইয়া ধরিয়া এমনভাবে তাহার মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, যে সেই সাক্ষাৎ পাওয়ার ধরার ফলেই কেমন সহজে অনন্তের নিগূঢ়ের যত আভাস ইঙ্গিত অফুরন্ত অভিব্যঞ্জনা সেখানে ফুটিয়া উঠিতেছে, ছুটিয়া পড়িতেছে। এ. ই.'র

> Like winds or water were her ways :
> They heed not immemorial cries ;
> They move to their high destinies
> Beyond the little voice that prays—

অথবা ইট্‌সের

In all poor foolish things that live a day,

Eternal Beauty wandering on her way—

যে একটা রূপ সৃষ্টি করিয়াছে, মনে হয় নির্নিমেষ সাক্ষাৎ দৃষ্টি যেন তাহাকে পাথর হইতে কুঁদিয়া বসাইয়া দিয়াছে—এমন স্ফুট, সুষীম, নিথর; অথচ ভাবপন্থী মিস্‌টিকগণ যে বিপুলতর জগতের অসীম অভিব্যঞ্জনা, সমুচ্চের অনন্ত ইঙ্গিত, যে একটা 'শেষ নাই, শেষ নাই' ভাবই চাহিয়াছে তাহারও কিছু অভাব কি আছে?

ইহার পরে যখন শুনি পল ভের্‌লেন-এর

L'atmosphere ambiante a des baisers de sœurs.[৩]

অথবা

Et pour sa voix lointaine, et calme, et grave, elle a

L'inflexion des voix chères qui se sont tues—[৪]

কিম্বা আমাদের রবীন্দ্রনাথের

কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে

সে যে আসে, আসে, আসে।

কত শ্রাবণ-অন্ধকারে মেঘের রথে

সে যে আসে, আসে, আসে—

তখন জ্ঞানের স্থির তপোদৃষ্টির দিকটা আমাদের উদ্বুদ্ধ হয় না—কবি সেদিকে জোর দেন নাই, দিতে চাহেন নাই, কবি ভাবে ভোর হইয়া অনন্তকে স্পর্শ করিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া উধাও হইয়া চলিয়াছেন। ইহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আছে, কিন্তু মনে হয় মানুষের একটা দিকের উপরই কবি

[৩] তরলিত বাতাসে মাখামাখি হইয়া গিয়াছে, যেন ভগিনী ভগিনীর চুম্বন।

[৪] তার সে স্বর কোন সুদূরের, আর কি প্রশান্ত, কি গম্ভীর—তাহাতে শুনিতে পাই যেন সেইসব প্রিয় কণ্ঠস্বরের মূর্চ্ছনা যাহারা নীরব হইয়া গিয়াছে।

বড় বেশী চলিয়া পড়িয়াছেন, অর্দ্ধপথ মাত্র আসিয়াই থামিতে চাহিলেন। কবি passive ভোক্তারূপেই বেশী আনন্দ পাইতেছেন ; কিন্তু মানুষ, বিশেষত কবি শুধু ভোক্তা নহেন, তিনি যে active কর্ত্তা, স্রষ্টা—সৃষ্টিতেই রূপগড়নেই যে তাঁহার তপঃশক্তির পরিচয়। ভেরলেন তাঁহার

L'inflexion des voix chères qui se sont tues

এই কথায় দূর হইতে কেমন ইঙ্গিতে মাত্র দেখাইয়া দিতেছেন একটা নিগূঢ় উপলব্ধি, আর-এক জগতের চক্রবাল। কিন্তু ইট্‌সের

Eternal Beauty wandering on her way

সেই অতীন্দ্রিয় জিনিষটিই যেন একেবারে আমাদের গোচর করিয়া সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছে, হাতের মধ্যে তুলিয়া দিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রাচীন কবিগণ দিয়াছেন শুধু স্থূলের কর্ম্ম-জগতের চিত্র, মানুষের বিচারবুদ্ধির মধ্যে তাহা যে রকমে প্রতিফলিত হইয়াছে, সেই রূপে সেই ভঙ্গীতে। ইহা সত্য, অনেকখানিই সত্য হইতে পারে—তবুও সব সত্য নয়। প্রাচীনের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ কবি—শেক্সপীয়র বা কালিদাস—তাঁহারা স্থূলের কর্ম্মজগতের কথা শুধুই যে বস্তুজগতের ভঙ্গিমায় বুদ্ধির খোলসে পরাইয়া দেখাইয়াছেন, ইহা ঠিক নয়। তাঁহারাও জ্ঞানপন্থী আধুনিক কবিদের মতই জ্ঞানের দেওয়া বিশেষ রূপ, তপঃশক্তির সুষীম রেখাবদ্ধ সৃষ্টিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাই উভয়ের মধ্যে পাই একটা সাদৃশ্য—বস্তুগত না হইলেও ভঙ্গীগত একটা সাদৃশ্য। উভয়েই রূপ দিয়াছেন, তবুও রূপের মধ্যে উভয়ত্রই আছে একটা অরূপের আভাস। শেক্সপীয়র যখন বলিতেছেন

On such a night
Stood Dido with a willow in her hand
Upon the wild sea-banks, and waved her love
To come again to Carthage—

অথবা সেই

> Look how the floor of heaven
> Is all inlaid with patines of gold—

তখনও সেখানে শুধু পাই কি বস্তুজগতেরই কথা, বুদ্ধির দেওয়া কাঠামো—সেখানে কি অনির্ব্বচনীয়, অনির্দ্দেশ্য রহস্য—মিস্‌টিক কিছু পাই না? বস্তুত মিস্‌টিকভাব অর্থে যদি বুঝি একটা অনন্তের, অনির্দ্দেশ্যের আভাস, তবে সে জিনিষটি সকল কবিত্বেরই মর্ম্মগত—উহা ছাড়া কবিত্ব, প্রকৃত কবিত্ব নাই।

তবে প্রাচীন আর আধুনিক সে জিনিষটিকে বিভিন্ন দিক হইতে দেখিয়াছেন, বিভিন্ন আকারে গড়িয়াছেন। আধুনিক মিস্‌টিক—তিনি জ্ঞানতন্ত্রীই হউন, আর ভাবতন্ত্রীই হউন—প্রাচীন অপেক্ষা আপনার সম্বন্ধে বেশী সচেতন (self-conscient), তাঁহার জ্ঞানে বিশ্লেষণের প্রভাব অধিক, তাঁহার অনুভূতি উপলব্ধি বস্তু সম্বন্ধে যতখানি নয়, তত্ত্ব (principles) সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশী সজাগ। প্রাচীনের দৃষ্টিতে বাহিরের জগৎটাই বড় হইয়া দেখা দিত, আর সে জগতের মধ্যেও পৃথক পৃথক ঘটনার বিশেষ বিশেষ বস্তুর উপরই তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইত। যেটি যখন তাঁহার চোখে পড়িত, সেটিরই রূপ, রূপের ভিতর দিয়া সেই-টিরই অন্তরাত্মাকে তাঁহারা উপলব্ধি করিতে করাইতে চাহিতেন। আধুনিক কিন্তু যখন এই রকম পৃথককে বিশেষকে এককে দেখেন, তখন তিনি সেটিকে আর-সকলের সহিত ধরিয়া মিলাইয়া তুলনা করিয়া আর-একটা বৃহত্তর উদারতর সাধারণ সত্যবস্তুকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহেন, সে সাধারণকেও ছাড়াইয়া আরও একটা বেশী সাধারণে উঠিতে তাঁহার প্রয়াস —এই রকমে তিনি যতক্ষণ অনন্তে শাশ্বতে অজানায়, ভগবানেরই মধ্যে না যাইয়া পড়িতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার তৃপ্তি নাই। তাই বিশেষ বস্তু, বিশেষ ঘটনা, বিশেষ নাম, বিশেষ রূপ তাঁহার কাছে তেমন সত্য, আপনার সত্তায়

আপনি পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয় না—এ-সব যেন আশ্রয় মাত্র, বাহিরের আবরণ মাত্র, ভিতরের চারিদিকের বিপুলতর নিগূঢ়তর তথ্যটির ব্যাখ্যার জন্য যতটুকু যেভাবে প্রয়োজন ততটুকুমাত্র সেইভাবে বাহিরের এই সকলের উপর দৃষ্টি দিলেই যথেষ্ট।

প্রাচীন বাহিরকে এপারকেই ফলাইয়া দেখাইয়াছে, অনন্ত রহস্য যাহা, মিস্‌টিক যাহা কিছু তাহা সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে গৌণত, তাহা আছে কেমন অলক্ষিতে ছায়ার মত। আধুনিক এই বাহিরকে এপারকে সরাইয়া ফেলিয়া দেখিতেছেন ভিতরের কলকব্জা, ওপারের ভাব প্রেরণা অনুভূতি—স্থুল সত্যের সহায়ে সাধারণভাবে অতীন্দ্রিয়কে উপলব্ধি করা নয় কিন্তু সূক্ষ্ম জগতের তথ্যের মধ্যে উঠিয়া অনন্ত অনির্দ্দেশ্যের কিছু নিকটস্থ হইতে, তাহাকে হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করিতে। প্রাচীন মিস্‌টিক কবি তুরীয়ের প্রেরণায় গড়িয়াছেন আমাদের স্থুল জগৎ—সেখানে মাঝের জগতের বিশেষ খবর পাই না, তুরীয়ও সেখানে তাই রহিয়াছে কেমন অন্তরালে। আধুনিক মিস্‌টিক এই মাঝের জগৎ—আমরা বলিতে পারি—এই missing linkকে ধরিতে চাহিতেছেন; তুরীয়ের প্রেরণায় তিনি গড়িতে চাহিতেছেন সূক্ষ্ম জগৎ; বস্তু বা ঘটনা যাহার প্রধান কথা নয় কিন্তু যেখানে খেলিতেছে বড় বড় ভাব, নিবিড়তর উদারতর অনুভূতি। অনন্তকে নামাইয়া একেবারে সান্তের বিগ্রহে ইহারা ধরিতে চাহেন না—সে বিগ্রহের চারিদিকে অনন্তের অভিব্যঞ্জনা যতই ছড়াইয়া পড়ুক না কেন; ইহারা চাহেন অনন্তকে অসীম কিছুর মধ্যে ধরিয়া দেখাইতে—তাহা ইট্‌স বা এ.ই.'র মত সুষীম তাত্ত্বিক জ্ঞানের রেখার মধ্যে হউক আর রবীন্দ্রনাথ বা ভেরলেনেরই মত তাত্ত্বিক ভাবের তরঙ্গায়িত রংএর খেলার মধ্যেই হউক।

ভারতী : বৈশাখ, ১৩২৬

ইউরোপীয় ট্রাজেডি ও ভারতীয় করুণরস

জিনিষ গড়িতে যেমন আনন্দ, ভাঙ্গিতেও ঠিক তেমনি আনন্দ। শুধু গড়ার জন্য যেমন গড়া, শুধু ভাঙ্গার জন্যই তেমনি ভাঙ্গা—ইহাতেই আনন্দ। কোন উদ্দেশ্য, কোন ফল বা অফল সম্মুখে রাখিয়া এ আনন্দ নহে, এ আনন্দ অহৈতুক নিরপেক্ষ। এই ভাঙ্গনের পদ্ধতিটি, তাহার মধ্যে যে রসটি, তাহা লইয়া হইতেছে ট্রাজেডি। বস্তু বস্তুর সংস্পর্শে কিরূপ চুরমার হইয়া যাইতেছে, ঘটনা ঘটনার সহিত সংযুক্ত হইয়া কিরূপে প্রলয়কে ডাকিয়া আনিতেছে, জগতের মধ্যে, মানুষের মধ্যে রুদ্রের সে তাণ্ডব নৃত্য তাহাই চিত্রিত করিতেছে ট্রাজেডি। বস্তুর ভাঙ্গনের অন্তরালে একটা গড়নের দিক আছে কি না, সংঘর্ষের পশ্চাতে শান্তি, বিরহের পরে মিলন, দুঃখের অবসানে সুখ আছে কি না বা থাকা উচিত কি না—এ প্রশ্ন না তুলিয়া, তাহার প্রতি অণুমাত্র দৃষ্টি না দিয়া শুধু ভাঙ্গন, শুধু সংঘর্ষ, শুধু বিরহ, শুধু দুঃখের খেলাকে তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়া ট্রাজেডি অপরূপ রস সৃজন করিয়া চলে।

এই হিসাবে ভারতীয় সাহিত্যে ট্রাজেডি বলিয়া জিনিষটি যে ছিল, এমন বোধ হয় না। ভারতীয় কবিবৃন্দ এই বৈপরীত্যের, এই ভাঙ্গনের দিকটা যে জানিতেন না, তাহা নহে। বিশেষরূপেই জানিতেন—ধ্বংসের মধ্যে, বিচ্ছেদের মধ্যে যে রস উদ্বেলিত, তাহার মহনীয় চিত্র আমরা যথাতথা পাই। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ছিল সর্ব্বদাই গড়নের, মিলনের, শান্তির রেখা টানিয়া ভাঙ্গনের খেলাকে সুবলয়িত করিয়া ধরা। দুঃখের কষ্টের চিত্র অঙ্কিত কর, যত মর্ম্মন্তুদ করিয়া চিত্রিত করিতে পার কর, কিন্তু সমাপ্তিতে চাই সুখ, স্বস্তি—মধুরেণ সমাপয়েৎ। ভারতীয় সাহিত্যে

পাই করুণরস, কিন্তু তাহা ট্রাজেডিতে পরিণত হয় নাই। পাশ্চাত্যও যে কোন দিন ঐ ভারতীয় ভাবের ভাবুক হয় নাই, তাহা নয়। ঐ কথাটিই মনে রাখিয়া লাতিন আলঙ্কারিক কাব্যরচনার সূত্র দিয়াছেন, Tragicum principium et comicum finem, কিন্তু বস্তুত ইউরোপের কবিপ্রাণে এ ভাবটি স্থান পায় নাই। দান্তে তাঁহার মহাকাব্যের নাম দিয়াছেন Divine Comedy, ইহার শেষ মিলনাত্মক। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ মহাকাব্য ট্রাজেডির রসেই ভরপূর। এ কমেডির অর্থ দুঃখেরই মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ নিহিত রহিয়াছে, জিহোবার ভ্রূকুটির মধ্যেই যে হাস্যরেখা লুক্কায়িত। দান্তের সমস্ত কাব্যটি জীবনের ট্রাজেডি প্রতিফলিত করিতেছে Inferno'র সেই বিখ্যাত ছত্রে—

Lasciate ogni sperranza voi ch'entrate.

প্রথমে বিয়োগের দৃশ্য, কিন্তু অন্তিমে মিলনের দৃশ্য—ভারতীয় কবিপ্রেরণা ইহাই চাহিয়াছে। কারণ কি? মানুষ সাধারণত ইহাই চাহে। দুঃখের মধ্যে আছে এক অস্বস্তি, এক অতৃপ্তি—তাহার মধ্যেই সব শেষ হইলে হৃদয়ে কেমন এক ফাঁক রহিয়া যায়, মনের প্রশ্ন অমীমাংসিতই রহিয়া যায়—ততঃ কিম্? এই প্রশ্নটুকু বুকে রাখিয়া অস্বস্তির ভারে পীড়িত হইয়া মানুষের পক্ষে থাকা দুরূহ। শেষ অর্থই ত মীমাংসা, তৃপ্তি—জিজ্ঞাসার মীমাংসা, প্রাণের তৃপ্তি। তাই কপালকুণ্ডলার পরিণাম জানিতে আমরা উৎসুক, পরিশিষ্ট লিখিয়া তাহার একটা পরিশেষ না পাইলে প্রাণটা কেমন চঞ্চল হইয়া পড়ে। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে যাহাই হউক, কবিও যে প্রাণের এই অস্বস্তি, এই অতৃপ্তি, এই জিজ্ঞাসা নিরসনের জন্যই অন্তিমে মিলনের, সুখের, হাস্যের অবতারণা করিয়া থাকেন, তাহা ঠিক নয়। ইহা অপেক্ষা গভীরতর কারণ আছে। কাব্যের লক্ষ্য ও কাব্যের উদ্দেশ্যের সহিত সে কারণ বিজড়িত। "

ভারতীয় কবিগণ কাব্যসৃষ্টিকেও আধ্যাত্মিকতা অথবা মানুষের পক্ষে উচ্চতর কল্যাণকর একটা কিছুর সহিত মিলাইয়া ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন, বলিয়াছিলেন—সা চ নিঃশ্রেয়সমূলম্। মানুষের মধ্যে মহত্তর বৃত্তি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, সাধারণ জীবনের খণ্ডতা, দ্বন্দ্ব, আবিলতার অতীতে আর-একটা অলৌকিক প্রতিষ্ঠানের বিমলতা, শান্তি, পূর্ণতাকে গোচর করিতে হইবে—ইহাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। সাহিত্য মানুষের অন্তরে একটা দিব্য চেতনা, একটা বিশুদ্ধ আনন্দ, একটা শান্তির সুষমা উদ্বুদ্ধ করিয়া দিবে। সাহিত্যও হইবে শিক্ষার ও সাধনার উপায়। মানুষের মন, মানুষের প্রাণ, মানুষের প্রবৃত্তিনিচয় এরূপভাবে পরিচালিত করিতে হইবে, এমন ছাঁচে ঢালিতে হইবে, এমন একটা সুরে বাঁধিয়া দিতে হইবে, যেন মহৎ জীবনের, উচ্চতর বৃত্তির, একটা দিব্য লোকেরই ছায়া তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইবার অবাধ অবসর পায়। সেইজন্য ভারতীয় সাহিত্য জগৎকে কেবলই নিরানন্দে দ্বন্দ্বে ভরিয়া, মানুষকে কেবলই অভিশাপগ্রস্ত করিয়া দেখাইতে চাহেন নাই। জগতে দুঃখ, দ্বন্দ্ব, ক্লেদ অতিমাত্রই আছে—সাহিত্যের মধ্যেও তাহাকে আবার টানিয়া লইব কেন? সাহিত্য জগতের প্রতিকৃতিমাত্র হইবে কেন? জগতের যে অভাব, মানুষের যে দৈন্য, তাহাকে পূর্ণতা ও ঋদ্ধির মধ্যে ধরিয়া দেখাইয়াই সাহিত্যের সার্থকতা। তাই বৈদিক ঋষি বলিতেছেন—কবিঃ কবিত্বা দিবি রূপমাসজৎ। কবি দেখাইবে দিব্য রূপ। তাই ভারতীয় কবি স্থূল জগতের দ্বন্দ্ব, নিরানন্দ, নশ্বরতাকে মিলনে, সুখে, স্থিতির মধ্যে—সকল অভিশাপকে দিব্য বরে মণ্ডিত করিয়া পরিসমাপ্ত করিয়াছেন। কটুর মধ্যে রস আছে, প্রবৃত্তির তৃপ্তিহীন সমাপ্তিহীন হাহাকারের মধ্যেও আনন্দ আছে। কিন্তু তাহা বিপরীত রস, আসুরিক আনন্দ। ভারতীয় কবি এই যে বিকার বিপর্যয়, তাহাকেই একান্ত করিয়া ধরেন নাই, তাহারই প্রভাব মানুষের মনে আঁকিয়া দিতে চাহেন নাই। জিনিষকে

ঋজু করিয়া স্থাপন করিয়া মানুষের মনে একটা দিব্য আনন্দই ফুটাইতে চাহিয়াছেন। শকুন্তলা কেন 'ওথেলো'র আদর্শে, কাদম্বরী কেন 'Bride of Lammermoor'-এর আদর্শে রচিত হয় নাই, তাহার কৈফিয়ৎ এইখানে।

আমরা এমন কথা বলিতেছি না, নীতিশিক্ষাদানই ভারতীয় কাব্যের লক্ষ্য ছিল। এমনও নয় যে, ভারতীয় কবিবৃন্দের সর্ব্বদা সজ্ঞান চেষ্টা ছিল, কি করিয়া মানুষের মধ্যে মার্জ্জিত রুচি, শোভনতর বৃত্তি, পরিশুদ্ধ অনুভূতি, মহনীয় কল্যাণকর কিছু প্রস্ফুটিত করা যায়। এই সকল ভাব বা আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারা কাব্যরচনা করিতে প্রয়াস পান নাই। কোন মহাকবিই এইরূপে কাব্য সৃষ্টি করেন না। কাব্য আত্মানুভূতির সহজ পরিস্ফূর্ত্তি। আমরা বলিতে চাই, ভারতীয় এই কবি-আত্মা একটি বিশেষ ধাতুতে গঠিত, একটি বিশেষ প্রকৃতি লইয়া উহার নৈসর্গিক অভিব্যক্তি। এই ধাতু, এই প্রকৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতের যে অতিপ্রাকৃতের সমুচ্চের প্রতি টান, বিশুদ্ধ বিরজ একেরই প্রতি অনুরাগ, তাহার সেই নিঃশ্রেয়সমুখী প্রেরণার জোরে। এই প্রকৃতি হইতেছে দৈবীপ্রকৃতি, উহা সত্ত্বগুণপ্রধান। এই ভারতীয় কলাসৃষ্টি মূলত হইতেছে শান্তরসাস্পদ, উহা সর্ব্বোপরি চায় ধ্যানের নিস্তব্ধতা, প্রসন্নতা। মিলনের হাস্যে উহার পর্য্যবসান। বুদ্ধমূর্ত্তির কথা ছাড়িয়া দিলাম। কিন্তু দেখ নটরাজ রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য—তাহার মধ্যে অপার্থিব শান্তিই ফুটিয়া উঠিয়াছে, প্রতি পদবিক্ষেপে সৃষ্টি ভাঙ্গিয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু অন্তরালে নবসৃষ্টির শতদল যেন বিকশিত হইতেছে। অন্যপক্ষে ইউরোপীয় কবিপ্রকৃতি এক আসুরিক তীক্ষ্ণতায় ভরা, উহা প্রধানত রজোগুণের খেলা। তাই গতি, সংঘর্ষ, বিক্ষোভের মধ্যেই তাহার আনন্দ। ইউরোপীয় শিল্পের ভঙ্গিমা একীকরণ ততখানি চায় না, সামঞ্জস্যই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। নির্ব্বাণের শান্তি সে চায় না, সে চায় প্রকাশের বৈচিত্র্যের ছন্দোময় দ্বন্দ্ব। এই ভারতীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত

জ্ঞানের প্রশান্ত কিরণলেখা ; ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রতিফলিত কর্ম্মের বিক্ষোভিত তরঙ্গমালা। ভারতীয় কবি উদাসীন, উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত যোগীর চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন—তাঁহার নয়নে প্রতিভাত 'শান্তং শিবং', সৃষ্টির ভরাটের দিকটি। ইউরোপীয় কবি কর্ম্মজগতে স্থাপিত কর্ম্মীর চক্ষে জগৎ দেখিতেছেন—সংঘর্ষের, ভাঙ্গনের ভঙ্গিমাটিই তাঁহার চক্ষে বড় হইয়া উঠিয়াছে। তাই মিলনের রসে ভারতীয় কবিপ্রাণ আপনাকে এমন মহনীয় করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন, আর বিচ্ছেদের রসেই ইউরোপীয় কবির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিসমুদায়।

ভারতে বিরহী-কবির সকল বেদনা, ক্ষুব্ধতা, নৈরাশ্যেরও অন্তরে রহিয়াছে কেমন একটি শান্ত রসের ছায়া, একটি ধৈর্য্য স্থৈর্য্য নির্ভরতা, কেমন একটি দিব্য প্রসন্নতা, আমরা যেমন বলিয়াছি, একটা স্নিগ্ধ সাত্ত্বিকতা। দুঃখ দ্বন্দ্ব যেখানে দুঃখত্বে, দ্বন্দ্বত্বে, আপন অবিমিশ্রিত স্বরূপসত্তায় উদ্ভিন্ন হইয়া উঠে নাই। করুণরসের অবতার বাল্মীকি বলিতে পারিয়াছেন

> তিষ্ঠ তিষ্ঠ বরারোহে ন তেঽস্তি করুণাময়ি।
> নাত্যর্থং হাস্যশীলাসি কিমর্থং মামুপেক্ষসে॥

করুণরসের ইহা পরাকাষ্ঠা। কিন্তু শেক্সপীয়রের সেই

> Absent thee from felicity a while
>
> And in this harsh world draw thy breath in pain—

ট্রাজেডির ইহা পূর্ণ প্রতিমা। শেক্সপীয়রের ভঙ্গিমার মধ্যে কেমন একটি আভাস পাই, সমস্ত জগৎখানি যেন খান খান হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, মানুষের সমস্ত সত্তাটি শতধা বিদীর্ণ হইয়া শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে। অরফিউ'র (Orpheus) দেহের ন্যায় সৃষ্টির প্রত্যঙ্গ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন ছিন্নভিন্ন হইয়া শুধু একটা হাহাকারের প্রতিধ্বনির মধ্যে দিক্‌প্রান্তে মিশিয়া গিয়াছে। তাহাদের উদ্ধার করিবার কোনই উপায় নাই, কোন্

প্রয়োজনও যেন নাই। একটা মহা অবসানের ঘনঘোরে নিরর্থক হইয়া পড়াই যেন সৃষ্টির সার্থকতা।

ভারতীয় নাট্যকার—কালিদাস বা ভবভূতি—কিরূপে করুণ রসটি সৃজন করিয়া তুলিয়াছেন, কি প্রণালীতে বিরহের লীলাটি ক্রমপ্রকট করিয়া ধরিয়াছেন এবং সে প্রণালীর সহজ গতি অনুসরণ করিয়া বিরহকে মিলনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ স্বস্তিপূর্ণ করিয়াছেন; আর ইউরোপীয় নাট্যকার—শেক্সপীয়র বা সোফোক্লা (Sophocles)—কিরূপে কোন্ প্রণালীতে বিরহের বিচ্ছেদের খেলাকেই পরিস্ফুট করিয়া ধরিয়াছেন, পরিশেষে একটা বিরাট বিধ্বংসের মধ্যে সব নিঃশেষ করিয়াছেন; এই দুইটি চিত্র অতি মনোরম, অতি শিক্ষাপ্রদ। প্রাচ্য কবি করুণরসের অবতারণা করিয়াছেন, বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছেন, পরিণামের শান্তি ও মিলনকে গভীরতরভাবে অনুভব করাইবার জন্য। ঐক্যের প্রাণটি সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত করিবার জন্যই তাহারা আগে ভেদের খেলাটি দেখাইয়া লইয়াছেন। সংসারের বিচিত্র বহুভঙ্গিম দ্বন্দ্বভোগ যে যতখানি করিয়াছে, অন্তিমে সন্ন্যাসের সমরস সে ততই তীব্রভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। আদিপর্ব্ব, যুদ্ধপর্ব্ব, শান্তিপর্ব্ব—ইহাই জীবনের ক্রম। শিল্পে রসসৃষ্টিরও এই একই ক্রম। ইউরোপ জীবনকে এ ভাবে দেখে নাই। দ্বন্দ্ব হইতে জীবনের উদ্ভব, দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া দ্বন্দ্বেই উহার পর্য্যবসান। ভারতীয় প্রতিভা ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়া গড়ার দিকটা দেখাইয়াছে, ইউরোপীয় প্রতিভা ভাঙ্গনের মধ্য দিয়া ভাঙ্গনের দিকটাই দেখাইয়াছে। দার্শনিকতত্ত্ব হিসাবে ভারতের উপলব্ধিটিই বোধ হয় পূর্ণতর সত্য। কিন্তু কবির লক্ষ্য কেবল সেই সত্যটিই নহে যাহা পূর্ণতম, ব্যাপকতম—সত্যের ব্যাপ্তি (comprehensiveness) তিনি ততখানি দেখাইতে চাহেন না যতখানি তিনি দেখাইতে চাহেন নিগূঢ় অন্তর্ভাবটি (intensiveness)। বস্তুত দার্শনিকেরই চেষ্টা হইতেছে বাহির করা সেই এক সত্যটি, কবি কিন্তু

দেখেন বহু সত্য, এক সত্যেরই যে নানা দিকটি—নানা ভাব, নানা রস, নানা রূপ। কবি যখন দৃষ্টিপাত করেন দুঃখ দ্বন্দ্ব বিনাশের উপর, তখন তিনি যদি উহাদের যে স্ব স্ব ধর্ম্ম, স্ব স্ব গুণ, কেবল তাহাই পরিলক্ষিত করেন, তাহারই সত্য-আত্মা, নিভাঁজ সত্তাটি ফুটাইয়া তুলেন, তবে তাহাতেই তাঁহার কবিত্বের পূর্ণ সার্থকতা।

ইউরোপীয় কবি এই যে ভাঙ্গনের দিকটা দেখাইয়াছেন, এই যে বিয়োগাত্মক রস সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার মধ্যে আছে কেমন যেন একটা তীব্রতা, একটা ঝাঁঝ, একটা ঝাল। ইউরোপীয় কাব্যজগৎ হইতে যাঁহারা হঠাৎ ভারতীয় কাব্যজগতের মধ্যে আসিয়া পড়েন, তাঁহারা বোধ করেন কেমন এক স্বাদের অভাব—অতিমাত্র সুন্দর মনোহর হইয়াও অথবা সেইজন্যই কেমন একটা নীরসতায় মাখা। ভারতীয় কাব্য নাটকাদি কখন কখন ইউরোপীয়দিগের নিকট যে artificial নাম পায়, তাহার কারণও ঐখানে। অন্যপক্ষে ভারতীয় কাব্যরসে যাঁহারা বর্দ্ধিত তাঁহারা ইউরোপীয় কাব্যের সংস্পর্শে আসিয়া উহার দ্বন্দ্ব বিরোধ ধ্বস্তাধ্বস্তি দেখিয়া সহজেই যে বলিয়া উঠিবেন—কি বর্ব্বরতা, কি প্রাকৃতজনসুলভ মাদকতা, তাহাও কিছু আশ্চর্য্য নহে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু ভারতীয় কবি artificial নহেন, ইউরোপীয় কবিও বর্ব্বর নহেন। দুইজনেই artistic. তবে দুই রকম আর্ট, দুই রকম রসসৃজন।

দ্বন্দ্বের মধ্যে, সংঘর্ষের মধ্যে, জীবনের বিষময় পরিণামের মধ্যে যে আনন্দ লুক্কায়িত, তাহা প্রাকৃতজনের উপলব্ধি নহে, তাহা কবিদৃষ্টিরই উপলব্ধি। হইতে পারে এ দৃষ্টি ইহমুখী, কিন্তু তাই বলিয়া উহা কম সুন্দর, কম সত্য নহে। ইউরোপের এই প্রতীতিকে ভারতবর্ষ একান্ত করিয়া লয় নাই। সে চাহিয়াছে সমুদ্রের যে শান্তি, যে সামঞ্জস্য, যে মিলন, তাহাই সুষমায় ভরিয়া সব কিছু গড়িতে, সাজাইতে। কিন্তু ঠিক এই জন্যই যে কাব্যহিসাবে উহা শ্রেষ্ঠতর হইবে, তাহাও আবার নয়। আমরা

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় কবি দৈবীপ্রকৃতি, সত্ত্বপ্রধান; ইউরোপীয় কবি আসুরীপ্রকৃতি, রজঃপ্রধান। ইহাতে একটু ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। সত্ত্বপ্রধান হইলেই কবিত্ব হিসাবে তাহা শ্রেষ্ঠতর হইবে, আর রজঃপ্রধান হইলেই যে তাহা হীনতর হইয়া পড়িবে, এ কথা সত্য নয়। কবির যে দৃষ্টি তাহা ত্রিগুণাতীত। উহা ত্রিগুণাতীত, সেইজন্যই যে কোন গুণের প্রেরণা লইয়া সে সৃষ্টি করিতে পারে। কবি সিদ্ধপুরুষ, তাই তিনি দিব্যভাব বা আসুরীভাব উভয়ের মধ্যেই আপনাকে পূর্ণভাবে প্রকটিত করিতে পারেন। কবিত্বের দিক হইতে, রসসৃষ্টির দিক হইতে তাহাতে কোন অঙ্গহানি হইবে না।

নারায়ণ: বৈশাখ, ১৩২৬

আর্টের আধ্যাত্মিকতা

কলাবিদ্যার সহিত ধর্ম্মজীবনের কোন স্বাভাবিক বিরোধ আছে কি? পিউরিটানগণ (Puritan) কাব্য সঙ্গীত বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহুদির ধর্ম্মশাস্ত্রে (Talmud) মানুষ হউক দেবতা হউক কাহারও প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করা একেবারে নিষেধ। প্লেতো তাঁহার আদর্শমনুষ্য-সমাজে (Republic) কবিকে আসন দিতে চাহেন নাই। আধুনিক জগতেও কাব্যে সঙ্গীতে চিত্রে ভাস্কর্য্যে আমরা চাহিতেছি Idealism, অর্থাৎ যাহা উচ্চভাবের উদ্বোধক—যাহা অধ্যাত্মবোধের সহায়, ধর্ম্ম-জীবনের উদ্দীপক। ইহসর্ব্বস্ব যে চারুকলা তাহা ছাড়িয়া আমরা চাহিতেছি সেই কলা যাহা ভগবানের সহিত আমাদিগকে পরিচিত করাইয়া দেয়। মানুষের অধোমুখী প্রবৃত্তিসকলের মূর্ত্তি যে কলা ফুটাইয়া তুলে তাহা হইতে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিতে চাহিতেছি উচ্চতর মহত্তর শুদ্ধতর প্রেরণার চিত্র।

অধ্যাত্মবিদ্যাই পরাবিদ্যা, আরসব অপরাবিদ্যা। ধর্ম্মজীবনই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র স্পৃহনীয় বস্তু। ইহাই যদি সত্য, তবে যে বস্তু ধর্ম্মের সহায় মানুষ শুধু তাহাই চাহিবে—ধর্ম্মের যাহা পরিপন্থী তাহা হইতে মানুষ দূরে থাকিবে। সকল অপরাবিদ্যা সেই এক পরাবিদ্যারই সোপানস্বরূপ সৃজন করিতে হইবে। জগতের যদি কিছু মহিমা বা সৌন্দর্য্য থাকে তাহা ভগবানে, তাই অপরাবিদ্যার সার্থকতা একমাত্র পরাবিদ্যার অনুচর হইয়া। এই সূত্রটি আমরা আজ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছি। কিন্তু এই সূত্রটি কতদূর সত্য, ইহার প্রকৃত অর্থই বা কি?

প্রথমেই আমরা বলিতে চাই চারুকলা বা আর্টের উদ্দেশ্য রসসৃষ্টি।

ভগবৎ-উপলব্ধিতে এক রস, রমণীসম্ভোগে আর-এক রস। শিল্পী এই দুই বিষয়ের যে কোনটি লইয়া এক রসপূর্ণসৃষ্টি করিতে পারেন। রমণী-সম্ভোগের চিত্র ধর্ম্মজীবনের পক্ষে হানিকর হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ রসসৃষ্টির দিক দিয়া দেখিলে তাহার মূল্য যে কম হইবে এমন বাধ্য-বাধকতা আছে কি? প্রতিপক্ষ উত্তরে বলিবেন, ভগবানই একমাত্র পূর্ণ রসের আধার। সাধারণ জাগতিক জীবনে রসের বা সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, কিন্তু সে রস, সে সৌন্দর্য্য ভগবানেরই অংশ বা ছায়া, বেশীর ভাগই তাহা বিকৃত অংশ, বিকৃত ছায়া মাত্র। রমণীসম্ভোগের কাহিনী অতি মনোমুগ্ধকর হইতে পারে, কিন্তু উহার মধ্যে যদি এমন কিছু না পাই যাহা ভগবানের দিকেই আমাদের দৃষ্টি পরিচালিত করে, তাঁহারই রসমূর্ত্তিটি ফুটাইয়া তুলে, তবে রসসৃষ্টির দিক দিয়াও উহার পূর্ণ সার্থকতা নাই। যেমনতেমন ভাবে রসসৃষ্টি করিলেই যদি আর্ট হয়, তবে শিল্পী যে কোন বিষয় লইয়া যে কোন প্রকারে তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ রস, রসের পূর্ণতা যদি কিছু দেখাইতে চাহেন, তাহা হইলে শিল্পী যেন ভগবানকেই বাক্যে, শব্দে, চিত্রপটে, প্রস্তরখণ্ডে ফুটাইয়া তুলেন।

কিন্তু সমস্যা হইতেছে ভগবান কি, ভগবানের রসমূর্ত্তিই বা কি? ভগবান বলিলে একটা নির্দ্দিষ্ট অবিকল্প বস্তুবিশেষ বুঝায় না। ভগবানের বহু মূর্ত্তি—কে যে কত ভাবে দেখিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রথমেই তাই আমাদের সন্দেহ আসিতে পারে, সাধুর ভগবান ও শিল্পীর ভগবান কি একই, না উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে? সাধু যে চক্ষে ভগবানকে দেখেন, শিল্পী ভগবানকে সেই চক্ষে নাও দেখিতে পারেন। সাধু ভগবানের যে রসমূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছেন, শিল্পী ঠিক তদ্রূপ পূর্ণভাবেই অন্য-এক রসমূর্ত্তির পরিচয় পাইতে পারেন।

বস্তুত সাধু বা ধার্ম্মিক দেখেন সেই ভগবান যিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ—

ইহলোকের প্রেরণাদি যাঁহাকে কলঙ্কলিপ্ত করে না। মানুষে যে মলিনতা, যে ইন্দ্রিয়বিক্ষোভ, যে স্থূলত্ব দেখিতে পাই, সে সকলের নিতান্ত অভাব যেখানে, শুধু সেইখানেই সাধুর ভগবান প্রকট। জগতের সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক লীলার পশ্চাতে, জগতের সকল পাপ হইতে মুক্ত মঙ্গলময় এই ভগবানকেই যে শিল্পী লক্ষ্য করিয়াছেন, সেই শিল্পীই তাঁহার কাছে প্রকৃত শিল্পী। সাধুর কাছে সেই শিল্পীরই আদর মানুষকে যিনি দুঃখ দৈন্য ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের অতীত করিয়া এক মহত্ত্বের আভায় রচিত করিয়াছেন। সাধুর কাছে ভগবান সদাচারী মুক্তপুরুষ হইলেও হইতে পারেন; শিল্পী কিন্তু তাঁহাকে শরীর মন প্রাণের দাস বলিয়াও জানে। ত্যাগের মধ্যে, শুচির মধ্যে সাধুর আনন্দ—শরীরের ভোগের মধ্যে, এমন কি যাহাকে আমরা অশুদ্ধভোগ বলি তাহার মধ্যেও যে আনন্দ রহিয়াছে, সে আনন্দ যে ভগবানেরই আনন্দ, তাহা যে হীনতর নয়, ইহা শিল্পীই দেখাইতে পারেন; এইখানেই শিল্পীর শিল্প। শান্ত শুদ্ধ আনন্দে সাধু যদি ডুবিয়া থাকেন, মরজীবনের উদ্বেলিত স্রোতের মধ্যেই শিল্পী যে অমৃতরস পাইয়াছেন তাহা যদি তিনি উপভোগ না করিতে পারেন, তবে ভগবানকে তিনি খণ্ডীকৃত করিয়াই কি দেখেন নাই? মানুষের মহত্ত্ব, উদারতা, অতীন্দ্রিয়তার মধ্যে ভগবান আছেন, আবার মানুষের ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা, ইন্দ্রিয়পরতার মধ্যেও সেই একই ভগবান। সাধু চাহেন প্রথমটি। শিল্পী কিন্তু দুইটিকেই সমানভাবে সত্যরসপূর্ণ করিয়া দেখাইতে পারেন।

সাধু ও শিল্পীর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এক নহে। সাধু এবং সংস্কারক জগৎকে মানুষকে একটা বিশেষ আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চাহেন। সতীধর্ম্ম, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতি এইরূপ এক-একটি আদর্শ। সাধু চাহেন জগতের সকল স্ত্রীই চিরকাল সতী হইবে, সকল মানুষই সত্যবাদী হইবে। অসতী স্ত্রীর চিত্র, মিথ্যাচারী মানুষের চিত্র, তাই তিনি দেখিতে

ও দেখাইতে চাহেন না। কারণ উহা মিথ্যাচারকে, অসতীত্বকে জাগাইয়া তুলিতে পারে। চাহি না যাহা তাহা বাস্তবজীবনেও যেমন চাহি না, সেইরূপ শিল্পকলাতেও তাহাকে চাহি না, কোন ক্ষেত্রে কোথাও তাহাকে চাহি না। শিল্পী কিন্তু বলেন, না চাহিতে পারি বটে, কিন্তু যাহা পাইতে চাহি না, হইতে চাহি না তাহার মধ্যেও ভগবানের, অনন্তের অনন্ত মূর্ত্তির এক মূর্ত্তি, তাহার মধ্যেও সত্যবস্তু রহিয়াছে, তাহারও 'কেন' 'কি' আছে, আমি তাহা বুঝিব, লোকচক্ষে ধরিয়া দেখাইব। পাপ না চাহিতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া উহার প্রতি অন্ধদৃষ্টি হইব কেন? বাস্তবজীবনে না হয় পুণ্যবানই হইলাম, জগতে পুণ্য প্রতিষ্ঠা করাই যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়। কিন্তু পুণ্যবান হইয়াও পাপের মধ্যে কি খেলা, কি উদ্দেশ্য, কি তত্ত্ব, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে বিরত থাকিব কেন? বৃদ্ধ হইতে কেহ চাহে না। চিরযৌবন পাওয়াই সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেবগণ চিরযুবা। কিন্তু সেইজন্য বলিতে হইবে কি বৃদ্ধত্বে কোন সত্যই নাই, কোন সৌন্দর্য্য নাই? না, বৃদ্ধকে শুধু এইভাবেই আঁকিতে হইবে যাহাতে লোকের মনে বৃদ্ধত্বের উপর একটা ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা জন্মায়, যাহাতে বৃদ্ধত্বকে ছাড়িয়া লোকে যৌবনের উপরই অধিকতর আকৃষ্ট হয়।

জগতে আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে শিল্পী তাঁহার শিল্পকে নিয়োজিত করেন না, সে আদর্শ যতই মহান হউক না কেন। আদর্শ নিত্যপরিবর্ত্তনশীল। কোন আদর্শ কোন যুগে ফুটিয়া উঠিয়া জগতের হৃদয় আকর্ষণ করিতেছে সেই অনুসারে শিল্পী তাঁহার প্রতিভা প্রচালিত করেন না। আর্ট দেশকালের অতীত। শিল্পী দেখেন শুধু চিরন্তন সত্য, উদাসীনভাবে ধ্যান করেন পাপপুণ্যে, ক্ষুদ্রে বৃহতে, অন্তের মধ্যে কল্যের মধ্যে ভগবানের বিচিত্র সত্তা। তাহাই তিনি ফলাইয়া লোকের নয়নগোচর করান। জগতের কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনকল্পে শিল্পীর শিল্প পরম সাহায্যকারী হইতে পারে, কারণ তিনি সেই উদ্দেশ্যটির সত্য সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিতে

সক্ষম। কিন্তু তাই বলিয়া শুধু এই কর্ম্মেই যদি শিল্পী আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন তবে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধই থাকিবে, জগতের রহস্য অনেকখানি আবরিত রহিয়া যাইবে, ভগবানের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যে যে কত রস উৎসারিত হইতেছে তাহার কোনই আস্বাদ পাইব না।

আর্টের বিচারকালে এই অনন্তরসবোধের কথা অনেক সময়ে আমরা ভুলিয়া যাই। তৎপরিবর্ত্তে সাধুর ন্যায় ভগবানের এক বিশেষ রূপ কল্পনা করিয়া, কখন বা ধার্ম্মিকের ন্যায় নৈতিক কল্যাণের মানদণ্ড দ্বারা আমরা আর্টের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে যাই। সামাজিক বা রাজনীতিক মঙ্গল-সাধনেও আর্টকে সময়ে সময়ে নিযুক্ত করি। মনুষ্যজাতির উন্নতির দিক দিয়া, ব্যবহারিক হিসাবে, দেশকালপাত্র হিসাবে ভগবানের এক বিশেষ মূর্ত্তির আরাধনা প্রয়োজন হইতে পারে। সামাজিক, নৈতিক, রাজনীতিক কল্যাণসাধনেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু এ সকল কিছু আর্টের অন্তরঙ্গ কথা নয়।

আমরা বলিয়াছি আর্টের মূল কথা হইতেছে চিরন্তন অনন্ত সত্য। এই সত্য হইতেছে বৃহৎ—সর্ব্বত্র বিস্তৃত। চক্ষুর কাছে যাহা সুন্দর বা অসুন্দর, সংস্কারের কাছে যাহা প্রিয় বা অপ্রিয়, বুদ্ধির কাছে যাহা ভাল বা মন্দ, সেই সকলের মধ্যেই একটা নিগূঢ় সত্য রহিয়াছে। বস্তুর যে গুণ, যে নিজস্বতা, যে বৈশিষ্ট্য, জগতের রঙ্গমঞ্চে তাহাকে যে ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাহাই হইতেছে সেই বস্তুর সত্য। এই সত্যটিই নিত্য, ইহাই রসপূর্ণ—এই জিনিষটিকেই শিল্পী দেখাইতে চাহেন। জগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান, ধার্ম্মিক সংস্কারক বা সাধুর কাছে সে সমস্তই মঙ্গলকর, প্রিয় বা সুবিধাজনক না হইতে পারে। কিন্তু কিছুই নিতান্ত অসত্য নয়। একটা কিছু সত্যপ্রাণকে আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক বস্তু প্রকাশিত হইতেছে। এই সত্যটিই তাহার আনন্দঘন-স্বরূপ, ইহাই তাহার সৌন্দর্য্য, ইহাই তাহার মধ্যে ভগবান। শিল্পীর লক্ষ্য এই

ভগবান। সাধুর বিরাট বৈরাগ্য ফুটাইয়া তুলিতে শিল্পীর যেমন কৃতিত্ব, কর্ম্মীর কর্ম্মপিপাসা ফুটাইয়া তুলিয়া তাঁহার ঠিক সেই একই কৃতিত্ব। কামীর কামোন্মত্ততা দেখাইয়াও তাঁহার মর্য্যাদার কোন হানি নাই। প্রকৃত অধ্যাত্মের সহিত আর্টের কোনও বিরোধ নাই। বরং অধ্যাত্মই আর্টের জীবন, তাহার প্রথম ও শেষ কথা। অধ্যাত্ম অর্থ আত্মা-সম্বন্ধীয়। যোগীর আত্মা কোথায়? তাঁহার যোগে। ভোগীর আত্মা কোথায়? তাঁহার ভোগে। যোগীর যোগীত্ব, ভোগীর ভোগীত্ব, দেবের দেবত্ব, পশুর পশুত্ব প্রকটিত করিতে পারিলেই শিল্পীর শিল্পের পরাকাষ্ঠা। এই হিসাবে শিল্পীই প্রকৃত অধ্যাত্মবাদী। করুণাবতার ভগবান তথাগতকে শিল্পী আঁকিয়া দেখাইতে পারেন। তাই বলিয়া রুদ্র-আত্মা নাদির শাহের প্রতিমূর্ত্তিকে শিল্পজগৎ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে কেন। কালিদাস আদিরসের অধ্যাত্মচিত্র দিয়াছেন। এই চিত্র যদি পাঠকের মনে আদিরসের ভাব জাগাইয়া তুলে তাহাতে কালিদাসের দোষ কি? কালিদাসের উদ্দেশ্যই ত এই ভাবটিকে গোচর করিয়া ধরা। মানুষের পক্ষে কোন অবস্থায় এই ভাবটি ধর্ম্মসাধনের বাধাস্বরূপ হইতে পারে, কিন্তু সেইজন্য উহা যে মূলত অসত্য বা অসুন্দর তাহা কে বলিবে?

নগ্ন নারীর চিত্র আমাদের চক্ষুকে যে পীড়িত করে তাহা শুধু আমাদের নীতিবোধের জন্য নহে, আমাদের সৌন্দর্য্যবোধের জন্যও বটে। কারণ সচরাচর যে চিত্র দেখি, তাহা চিত্র নয়, ফটোগ্রাফ মাত্র, প্রকৃতির হুবহু নকল। অসুন্দর কাহাকে বলি? অসুন্দর তাহাই যাহা বস্তুর বাহিরের চেহারাটি শুধু দেখায়, বস্তুর অন্তরের রহস্যটি যাহা বুঝাইয়া দিতে পারে না। ফটোগ্রাফ কুৎসিত, তাহা নগ্ন নারীরই হউক আর সাধু পুরুষেরই হউক। কারণ ফটোগ্রাফে নগ্ন নারীই দেখি, নগ্ননারীত্ব দেখি না, সাধুপুরুষের জটাবল্কল দেখি কিন্তু সাধুত্বের ব্যাখ্যা পাই না। আর্টের

দিক দিয়া বিচার করিলে বটতলার উপন্যাস যেমন কুৎসিত, রবিবর্ম্মার দেবদেবীর মূর্ত্তিও ঠিক তেমনি কুৎসিত। শুধু শরীর যেখানে, শরীরের পশ্চাতে গভীরতর কোন সত্যের মধ্যে শরীরের অর্থটি যেখানে পাই না, সাধুর অতীন্দ্রিয়পরতা, নীতিবাদীর শ্লীলতাবোধের দিক হইতেও যেমন তাহা হেয়, শিল্পীর সৌন্দর্য্যবোধের দিক হইতেও তেমনি।

উলঙ্গ রমণীর আত্মার কথাটিকে ব্যক্ত করিয়া যে শিল্পী উলঙ্গ রমণীর চিত্র আঁকিয়াছেন, তিনি উলঙ্গ রমণীকে লম্পটের দৃষ্টি দিয়া দেখেন নাই, সাধুর দৃষ্টি দিয়াও দেখেন নাই ; তিনি দেখিয়াছেন ঋষির দৃষ্টি দিয়া, তিনি উলঙ্গ করিয়াছেন ভাগবত এক সত্য। অপরে মনের খেলার দাস হইয়া বলিতেছে, ইহা শুদ্ধ উহা অশুদ্ধ, ইহা পুণ্য উহা পাপ। কিন্তু ঋষিকল্প শিল্পী দেখিতেছেন—সত্য কি ? বস্তুর নিগূঢ় তথ্য কি ? কোথায় রসের সহস্রধারা উৎস ?

কবি যিনি, দ্রষ্টা যিনি তিনি সৃষ্টি করেন সিদ্ধ অবস্থার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া। এ ভাব ভাল-মন্দ শুদ্ধ-অশুদ্ধ মঙ্গল-অমঙ্গলের অতীত। সিদ্ধের পূর্ণ সত্যানুভূতি অপরিণত সাধকের পক্ষে তাহার সাধনের দিক দিয়া দেখিলে সকল সময়ে স্পৃহনীয় না হইলেও হইতে পারে। তবুও সিদ্ধেরই অনুভূতি প্রকৃত সত্য। সাধকের জন্য যে সত্য তাহা ক্ষণিক সাময়িক, তাহার মূল্য সার্ব্বজনীন অথবা চিরন্তন নহে। কবির কথা সিদ্ধপুরুষের কথা। সাধন অবস্থার কোন মানদণ্ড লইয়া সে কথা বিচার করিতে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু তাই বলিয়া আবার এ-সব কথা যে সাধকের কাছ হইতে লুকাইয়া রাখিতে হইবে, সাধককে এ-সকল বিষয় হইতে যে দূরে দূরে রাখিতে হইবে তাহারও আবশ্যকতা কিছু নাই। উলঙ্গ নারীর চিত্র আমাদিগকে বিচলিত করিতে পারে। কিন্তু সেইজন্য উহাতে যে সত্য সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহার উপভোগ হইতে বিরত থাকিব কেন ? ইন্দ্রিয়কে দমনে রাখিতে যাইয়া

ইন্দ্রিয়ের সত্য ভোগকে নির্ব্বাসিত করিব কেন? ইন্দ্রিয়ের যে বাহ্যবিক্ষোভ তাহার ভয়ে ইন্দ্রিয়ের দেবতাকে অস্বীকার করা সত্যানুভূতিরই অন্তরায়।

কিন্তু সাধনার দিক হইতেও আর্টের যে মূল্য নাই এমন নহে। তবে শিল্পীর পথ ও সাধু বা ধার্ম্মিকের পথ এক নহে। সাধুর পথ 'ইহা নয়' 'ইহা নয়'; শিল্পীর পথ 'ইহাই' 'ইহাই'। সাধু চাহেন ইন্দ্রিয়কে দমনে রাখিয়া, ইহাকে দূর করিয়া শুধু অতীন্দ্রিয়ে পৌছিতে অথবা ইন্দ্রিয়ের কোন এক নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গী বা প্রকরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে। শিল্পী চাহেন ইন্দ্রিয়ের বিশ্ববিভূতির মধ্যেই অতীন্দ্রিয়কে বোধ করিতে। আচার নিয়মের মধ্য দিয়া সাধু ধর্ম্মজীবন গঠিত করিতে চাহেন। শিল্পীর আচার নিয়ম নাই। প্রথম হইতেই তিনি আপনাকে মুক্ত বলিয়া মানিয়া লন। এই শ্রদ্ধাটুকু সর্ব্বদার জন্য ধরিয়া রাখিলে জীবনেও তিনি মুক্ত সিদ্ধ হইতে পারেন। সাধু তাঁহার সাধুত্বের, ধার্ম্মিক তাঁহার ধর্ম্মশীলতার পরিমাপ করেন কোন্ বিষয়ে কোন্ বস্তুতে তাঁহার মতি বা অমতি, সেই বিষয় সেই বস্তুর রূপ বিচার করিয়া দেখিয়া। শিল্পী কিন্তু বিষয়নির্ব্বাচনে মনোযোগ দেন না। তিনি জানেন বিষয়ে কিছু দোষ নাই। তিনি দেখেন শুধু তাহার অন্তর, তাহার সহজ সত্য প্রেরণা ও সেই অনুসারে যে বিষয়েই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন তাহা হইতেই সত্য সুন্দর মঙ্গলকে দৃষ্টিগোচর করিতে পারেন। আচরণ, উদাহরণ, শিক্ষা, ব্যাখ্যার সাহায্যে সাধু ধর্ম্মের সহিত, অধ্যাত্মের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে চাহেন, শিল্পী কিন্তু চাহেন শুধু ভাবের মধ্য দিয়া। ম্যাডোনার (Madonna) ছবিই তুমি অঙ্কিত কর, আর বারনারীর ছবিই অঙ্কিত কর, তোমার বিষয়টির কোন প্রকৃতিগত দোষ নাই। প্রশ্ন শুধু সত্য ভাবটিকে পাইয়াছ কি?

আর্টের প্রভাব প্রসার সূক্ষ্ম। স্থূলপ্রকৃতি আমরা তাহা সহজে অনুভব করি না। আমরা চাই স্থূল প্রভাব—স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া না

দিলে আমরা বুঝি না, লাঠ্যৌষধি না হইলে আমাদের চৈতন্য হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্র নীতিশাস্ত্রের তাই সৃষ্টি হইয়াছে। আর্টের মধ্যেও তাই নীতিবাদ প্রভৃতি মতবাদ প্রবেশ করাইতে চহিতেছি। নীতির প্রয়োজন থাকিলেও থাকিতে পারে, মানুষের স্থূলভাগটির পরিবর্ত্তনের সাহায্যের জন্য। কিন্তু মানুষের সূক্ষ্ম যে অন্তরের প্রকৃতি, তাহার অধ্যাত্মসত্তা কোন দিনই নীতির দ্বারা প্রবুদ্ধ হইবে না। আর্ট হইতেছে দৃষ্টি—Revelation. এই দৃষ্টি বস্তুর অন্তরতম রহস্যের সহিত সাক্ষাৎ-ভাবেই আমাদের এক সহজ পরিচয় স্থাপন করিয়া দেয়। অনেক সময় অজানিতভাবেই আর্টের সাহায্যে বস্তুর প্রাণের সহিত আমরা মিলিত হইয়া যাই। এই সম্বন্ধই রসের সম্বন্ধ। ইহাকেই ধর্ম্মসাধনের ভাষায় ভগবৎপ্রসাদ নামে অভিহিত করিতে পারি। এই ভগবৎপ্রসাদ যিনি পাইয়াছেন, ব্যবহার-শাস্ত্রের এমন কি সাধনারই বা তাঁহার প্রয়োজন কি? এই ভগবৎপ্রসাদের ফলে শিল্পী সহজেই কৃচ্ছ্র সাধনা ব্যতিরেকে ভোগের মধ্য দিয়া ইন্দ্রিয়লীলার সত্য-সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে করিতেই নির্ম্মল শুদ্ধচিত্ত আধ্যাত্মিকভাবে পরিপ্লুত হইতে পারেন।

প্রকৃতপক্ষে আর্ট ও ধর্ম্মের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নাই—ধর্ম্ম অর্থে নৈতিক আচার-বিচার বা সাধুজীবন না বুঝিয়া, বুঝি যদি সত্যধর্ম্ম, যাহা অধ্যাত্মদৃষ্টিগোচর। আত্মার সহিত পরিচিত হওয়াই যদি ধর্ম্মের লক্ষ্য, আর্টেরও তবে উহাই লক্ষ্য। অধ্যাত্মদ্রষ্টা আত্মাকে দেখিতে যাইয়া যদি আবার শরীরকে অথবা শরীরের কোন ভাগকে বাদ দিয়া না রাখেন, তবে শিল্পীও স্বচ্ছন্দে শরীরমধ্যে সকল রূপে আত্মার মহিমাকে বর্ণে শব্দে বাক্যে প্রস্তরফলকে মূর্ত্তিমান করিয়া পরম আধ্যাত্মিকতারই কার্য্য করিবেন।

নারায়ণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩

কাব্য ও তত্ত্ব

একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী সাহিত্য-সমালোচক শেক্সপীয়র ও মোলিয়ের এই দুইজনের নাট্যপ্রতিভা তুলনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, কাব্য-জগতের সর্ব্বত্র, তাহার আদি সৃষ্টিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত, এসখিল্ সোফোক্লা ইউরিপিদ হইতে কর্ণেই রাসীন, সকল কবিশ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে, তাঁহাদের সৃষ্টি যতই মহৎ হউক না কেন, সর্ব্বদাই আমরা একটা দোষের অবশেষ লক্ষ্য করি—তাহা হইতেছে একটা বর্ব্বরতার আভাস। প্রবৃত্তির স্থূল প্রাকৃতজনসুলভ লীলাভঙ্গীটি তাঁহারা অতিমাত্র করিয়া দেখিয়াছেন—সর্ব্বত্রই বলাৎকার, রক্তারক্তি, পাশবিক উপায়ে প্রবৃত্তির খেলা। একমাত্র মোলিয়ের তাঁহার বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব দেখাইয়াছেন এইখানে যে, প্রবৃত্তির খেলা চিত্রিত করিবার জন্য তিনি এইসব স্থূল বাহ্য উপকরণের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। মানুষকে দেখাইয়াছেন চিন্তা, ভাব, অনুভূতির চিত্র-বিচিত্রতার মধ্য দিয়া, সকল খেলা চলিয়াছে অন্তরে। উচ্চ কথা না কহিয়া, কোলাহল না করিয়া, লম্ফঝম্প না দিয়াও যে হৃদয়ের কাহিনী যথাযথরূপে, এমন কি গভীরতরভাবেই ব্যক্ত করা যায় তাহার দৃষ্টান্ত মোলিয়ের। মোলিয়ের দেখাইয়াছেন নিছক চরিত্র, নিছক মনস্তত্ত্ব। প্রবৃত্তির যে আবিল আবেগময় স্থূল বিকাশ, তাহার উপর তিনি ততখানি জোর দেওয়া প্রয়োজন বা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। সমালোচক তাই শেক্সপীয়র-সৃষ্ট তাইমন ও মোলিয়ের-সৃষ্ট আলসেস্ত এই দুইটি চরিত্র উদাহরণস্বরূপ লইয়া বলিতেছেন, শেক্সপীয়র কি উগ্র বন্যপশুবৎ মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; মোলিয়েরে শরীরগত সে উচ্ছৃঙ্খলতা, ইন্দ্রিয়গত সে উন্মত্ততা নাই; কিন্তু তাইমন অপেক্ষা

আলসেস্তেই কি মানববিদ্বেষীর গভীরতর তত্ত্বচিত্র ফুটিয়া উঠে নাই ?

শেক্সপীয়র ও মোলিয়েরের যে দুইটি চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা তুলনা করিয়া কাহার স্থান নিম্নে কাহার স্থান উচ্চে, ইহা নির্দ্ধারণ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের বিচার্য্য সমালোচকের মূল বক্তব্যটি। বর্ত্তমান কালে কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে এইরূপ একটা ভেদ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা হইতেছে যে, তত্ত্ববোধ আর ইন্দ্রিয়জবিকার এই দুইটি জিনিষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী। সূত্রস্বরূপ তাই দেওয়া হইতেছে, কবি সৃষ্টি করিবেন তত্ত্ব ; ইন্দ্রিয়-উত্তেজনা, স্থূল বিকার কাব্যের বস্তু হইতে পারে না, কাব্যে তাহার আর স্থান নাই। কারণ, প্রথমত কবির উদ্দেশ্য মানুষের গভীরতম কথা যাহা, যাহা অন্তরের বস্তু, যাহা আত্মার অনুভূতি, তাহাই প্রকাশিত করা। স্থূল ইন্দ্রিয়ের স্থূল বিক্ষোভ মানুষের অন্তরের, আত্মার কথা নয়। দ্বিতীয়ত, মানুষ আর পূর্ব্বের মত অতিমাত্র ইন্দ্রিয়পরিচর্য্যানিরত নহে, তাহার মধ্যে উচ্চতর বৃত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, নব নব অভিজ্ঞায় সে পূর্ণতর হইতেছে। কালিদাস, শেক্সপীয়র এ সকলের বার্ত্তা কিছুই জানিতেন না, তাই ইহাদের ছায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। মানুষ এখন জগৎকে জীবনকে দেখিতেছে এক নূতন দৃষ্টি দিয়া, সভ্যতা ভাবুকতার জ্ঞানবিজ্ঞানদীপ্ত বুদ্ধিপরিশুদ্ধ বৃত্তির চক্ষে। এখনকার কবিও তাই শেক্সপীয়র ও কালিদাসের মত ইন্দ্রিয়গত অনুভূতিকে একান্ত করিয়া কাব্য সৃষ্টি করিবেন না। তৃতীয়ত, কাব্যের মহত্ত্বই এইখানে। যে কবি প্রাকৃতজনের অনুভূতি ও ভঙ্গী লইয়া কাব্য রচনা করেন, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কবি তিনিই যিনি কবি ও মহাপুরুষ একাধারে, যিনি মানুষকে শুধু আনন্দ দিয়াই নিশ্চিত নহেন কিন্তু তাহাকে মহীয়ান দেবতুল্য করিয়া তুলিতে চাহেন।

কাব্যের বিষয় তত্ত্ব, এই কথাটি আমরা সর্ব্বপ্রথমে বুঝিতে চেষ্টা করিব। তত্ত্ব কি ? বস্তুর যাহা সনাতন গুণ, যাহা আশ্রয় করিয়া বস্তু

বস্তু হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, সেই আদিপ্রাণ, সেই মূল সত্যই উহার তত্ত্ব। বস্তুর যে স্থূল বিকার তাহা তাহার তত্ত্ব নহে। স্থূল বিকারের কারণ যাহা, যে গুণসমাবেশ হইতে এই ইন্দ্রিয়গত বিক্ষোভ উদ্ভূত তাহাই হইতেছে তত্ত্ব। যেমন প্রেমের তত্ত্ব হইতেছে ভালবাসা। প্রেমের স্থূল বিকার হইতেছে ইন্দ্রিয়জ শরীরজ সেই স্বেদ কম্পন পুলক ইত্যাদি—Emerson যেমন বলিয়াছেন, touching and clawing—এ-সকল তত্ত্ববস্তু নহে। অতএব বলা হইতেছে কবি শরীরজ বিকারের কথা না বলিয়া দেখাইবেন হৃদয়গত বৃত্তিটির গতি, শুধু ভালবাসার প্রকরণ। কেবল ইহাই নয় প্রেমকে শরীরের দিকে টানিয়া না আনিয়া, উহাকে সমুচ্চে তুলিয়া ধরিব, মিলাইয়া দিব বিশুদ্ধের, অনন্তের, ভগবানের সহিত। বিদ্যাপতির মত আর বলিব না

পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব।
পানিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব॥

এখন বলিব রবীন্দ্রনাথের কথায়

আমার অতীত তুমি যেথা, সেইখানে
অন্তরাত্মা ধায় নিত্য অনন্তের টানে।

অথবা ব্রাউনিংএর মত শান্ত উদাত্ত তত্ত্বজ্ঞানে পরিপ্লুত হইয়া মানব-জাতিকে সান্ত্বনা দিব

God's in His Heaven
All's well with His world.

কিন্তু শেক্সপীয়রের মত ইন্দ্রিয়জগতের দাস হইয়া প্রাকৃতজনের ক্ষুব্ধ চিত্ত লইয়া বলিব না

And in this harsh world draw
thy breath in pain.

তত্ত্ব শুধু তত্ত্ব হিসাবেই বিশুদ্ধ সত্য। ভূতবস্তু, স্থূল বিকাশ, ইন্দ্রিয়-

বিক্ষোভের মধ্যে উহা পরিস্ফুট নয়। অতএব কাব্যে উভয়ের যুগপৎ স্থান হইতে পারে না। সর্ব্বপ্রথমে আমরা এই সিদ্ধান্তের বিচার করিব। বস্তুর অতিমাত্র যে বাহ্য রূপ, তত্ত্ব তাহার অতীত জিনিষ; আত্মা যে দেহকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে, আমরাও অস্বীকার করিব না। কিন্তু এই আত্মাকে, এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করিবার ও প্রকাশিত করিবার নানা ভঙ্গী আছে। মানুষে মানুষে, সাধকে সাধকে যে পার্থক্য তাহা অনুভূতির মূল বস্তুটি লইয়া নয়, তাহা এই অনুভূতিরই প্রকার লইয়া। কবি ও দার্শনিকে যে প্রভেদ তাহাও এই ভঙ্গীরই বিভিন্নতা। কবিও তত্ত্বকে দেখেন কিন্তু এক দৃষ্টি দিয়া নহে। দার্শনিক তত্ত্বকে দেখেন বিচারবুদ্ধির সাহায্যে, চিন্তার দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া তিনি তত্ত্বকে বোধগম্য করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার কাছে ঘটনা বা স্থূলবস্তুর নিজস্ব মূল্য কিছু নাই, উহার অন্তরালে যে তথ্য লুক্কায়িত তাহাকেই তিনি ধরিয়া দেখান—তিনি চাহেন শুধু চিন্তাজগতের কথা। বাস্তবিকপক্ষে তত্ত্ব অর্থে আমরা ধরিয়া লইয়াছি এই চিন্তাজগতের কথা। তত্ত্ব যে উহা অপেক্ষাও গভীরতর জিনিষ ইহা ভুলিয়া গিয়াছি। তাই, যখন কবিকে বলি যে তিনি বিশ্লেষণমুখী বুদ্ধির সাহায্যে শুধু চিন্তাজগতের কথা বলিবেন তখন ফলত কবিকে দার্শনিকেরই কার্য্য করিতে বলিতেছি। কবির লক্ষ্য যে তত্ত্ব তাহা দার্শনিক তথ্য নহে, তাহা তর্কবুদ্ধিপ্রসূত নহে। কারণ, তাঁহার উদ্দেশ্য তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া নহে, তাঁহার উদ্দেশ্য তত্ত্বের সৃষ্টি। কবি যখন কাব্য রচনা করেন, তখন তিনি একটা কিছু প্রমাণিত করিতে অগ্রসর হন না। তিনি চাহেন শুধু মূর্ত্ত প্রকট করিয়া তুলিতে যাহা তাঁহার অন্তরের দৃষ্টিতে জাগরূক হইয়াছে। কবির দৃষ্টিতে যে বিশ্লেষণ নাই তাহা নয়, কিন্তু উহা তর্কবুদ্ধির বিশ্লেষণ নয়। সাক্ষাৎদৃষ্টির সহচর যে 'বিবেক' তাহার দ্বারাই বস্তুসমূহের শতমুখী পার্থক্য, বৈচিত্র্যময় লীলা এক সহজ

ঐশ্বর্য্যবলে তিনি ফুটাইয়া তুলেন। দার্শনিক সত্যকে দেখেন সঙ্কীর্ণ করিয়া, তাহার একটিমাত্র প্রকরণ, তাহার তাত্ত্বিকরূপ অর্থাৎ চিন্তার ক্ষেত্রে তাহার যেমন বিকাশ। কবি সত্যকে সৃষ্টি করেন একটি সমগ্রতায় পূর্ণ করিয়া। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' রূপক হিসাবেই যতখানি লিখিত হইয়াছে, কবিত্ব হিসাবে তাহার মূল্য তত কম। কারণ, আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে তিনি যে স্থূল দেহ দিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, সে স্থূল দেহকে তিনি অবহেলাভরেই দেখিয়াছেন, তাহাকে লইয়াছেন শুধু অবান্তর অলঙ্কাররূপে—তাই তত্ত্ব ও স্থূল বস্তু একই মহৎ সত্যের মধ্যে একীকৃত হইয়া উঠে নাই, উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে এক কৃত্রিমতার সংযোগ। সমস্ত কাব্যেও তাই এই কৃত্রিমতার অসরলতার ছায়া। কিন্তু কালিদাসের কুমারসম্ভব আধ্যাত্মিক না আধিভৌতিক বস্তু লইয়া? উভয়কে বিযুক্ত করিয়া দেখিবে কে?

এইটুকু বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে কবির চক্ষে স্থূল ও সূক্ষ্মের সমান মূল্য। সূক্ষ্মই আসল জিনিষ; স্থূল শুধু সূক্ষ্মের অলঙ্কার, উপমান বা সাঙ্কেতিক চিহ্ন এরূপ নয়। সূক্ষ্ম ও স্থূল একই জিনিষের দুই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকাশ মাত্র। বৈদিক ঋষিগণের এ বিষয়ে যে গভীর অনুভূতি ছিল তাহা অতুলনীয়। তাঁহারা জ্ঞানের দেবতার নাম দিয়াছেন সূর্য্য, তপঃশক্তির নাম দিয়াছেন অগ্নি। কেন? ইহা শুধু তুলনা নয়, উদাহরণ বা কোন বিশেষ অর্থহীন সংজ্ঞা মাত্র নয়। শুধুই যদি সংজ্ঞা হইত তবে জ্ঞানের নাম অগ্নি, শক্তির নাম সূর্য্য হইতে কোন বাধা থাকিত না। ঋষিগণ কিন্তু দিব্য কবিদৃষ্টি দিয়া দেখিয়াছেন যে অতীন্দ্রিয়ে তত্ত্বে যাহা জ্ঞান, স্থূলে জাগতিক ক্ষেত্রে তাহাই সূর্য্য—একই বস্তু; উভয়ের আত্মার ধর্ম্ম হইতেছে প্রকাশ। অগ্নির যে গুণ তাপ, মূলত তাহাই তপঃশক্তির ধর্ম্ম। সূর্য্যই জ্ঞান, অগ্নিই শক্তি—ইহা শুধু রূপক নয়, ইহা ভাববিলাসীর কল্পনা নয়। কবির সহজ প্রেরণাই তাই

হইতেছে তত্ত্বকে নিছক তত্ত্বরূপে দেখা নয়, কিন্তু তত্ত্বকে বিষয়ের বস্তুর মধ্যে ধরিয়া শরীরী করিয়া দেখা। সূক্ষ্মজগতে ভাবের মধ্যে যাহা তত্ত্ব, স্থূলে ইন্দ্রিয়জগতে তাহাই বস্তু তাহাই ঘটনারাজী; তত্ত্বের জীবন্ত বিগ্রহ হইতেছে স্থূল—একটি সৃষ্টি করিতে গিয়া আর-একটি সহজেই উহার সহিত সৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাই কালিদাসের কুমারসম্ভব তত্ত্বকথারূপে লিখিত না হইলেও, এত সহজেই উহার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হইয়াছে। তাই পরমতত্ত্ববাদী, আধ্যাত্মিকতাপরিপ্লুত বৈদিক ঋষিগণের মুখ হইতে তত্ত্বকথা বলিতে যাইয়া সহজেই বাহির হইয়া পড়ে

যত্র নারী অপচ্যবং উপচ্যবং চ শিক্ষতে।

তত্ত্ব ও বস্তু, অত্র ও অমুত্রের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সামঞ্জস্য, যে নিগূঢ় একাত্মতা কবির অখণ্ড দৃষ্টিতে তাহাই ফুটিয়া বাহির হয়। কবির ইহা স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তারপর, আমরা বলিয়াছি কবির কার্য্য মুখ্যত বিশ্লেষণ নয়, তাঁহার কার্য্য সংশ্লেষণ অথবা সৃজন। এই সৃষ্টির প্রকৃতিই হইতেছে চলন্ত জীবন্ত রক্তমাংসের প্রতিমা। শুধু যাহা ভাবে, শুধু যাহা চিন্তায়, তাহা হিরণ্যগর্ভের কল্পনা মাত্র; বিরাটের মধ্যে স্থূল পর্য্যন্ত যাহা প্রসারিত হয় নাই, তাহা সৃষ্টি নয়। ইন্দ্রিয়স্পর্শের দ্বারা তত্ত্বকে শরীরী করিয়া তুলাই সৃষ্টি। ভগবানের সৃষ্টি সম্বন্ধে এ কথা যেমন প্রযোজ্য, কবির সৃষ্টি সম্বন্ধেও তেমনি।

এখন আর-একটি কথা বুঝিতে হইবে—তত্ত্ব নানা প্রকার। ধ্যান-জগতের চিন্তাজগতের যেমন তত্ত্ব আছে, হৃদয়জগতের, বাসনাজগতের, ইন্দ্রিয়জগতের, কর্ম্মজগতের—প্রত্যেক জগতেরই তত্ত্ব আছে। ইহারা বিশেষ বিশেষ জগৎ, প্রত্যেকেরই এক-একটি ধর্ম্ম, এক-একটি বিশেষত্ব আছে। যখন বলা হয় কবি দেখাইবেন কেবল তত্ত্ব, বস্তুত তখন কবিকে আজ্ঞা করা হয় যে, ধ্যানজগতের চিন্তাজগতের প্রতীতি

দিয়াই তিনি অন্যান্য জগৎকে বোধ করিবেন; বিচারবৃত্তি, পরমার্থ অনুভূতির যে ছাঁচ তাহার মধ্যেই আর-আর জগতের তত্ত্বকে ঢালিয়া দেখাইতে হইবে। ইহা দার্শনিকের এবং সাধুপুরুষের কার্য্য হইতে পারে কিন্তু ইহা কবির কার্য্য নয়। চিন্তাজগতের তত্ত্বকে যেমন চিন্তার গতির মধ্য দিয়া তাহার বিশ্লেষণ করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে হয়, ইন্দ্রিয়-জগতের তত্ত্বকে ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভের মধ্য দিয়াই, কর্ম্মজগতের তত্ত্বকে কর্ম্মের মধ্য দিয়াই প্রকটিত করা যায়। গীতিকবিতায় ভাবোচ্ছ্বাসের সাহায্যেই প্রধানত আমরা তত্ত্বকথা ব্যক্ত করি; নাটকের প্রধান কথা কিন্তু 'নটন', অঙ্গসঞ্চালন, কর্ম্মের মধ্য দিয়াই এখানে তত্ত্ব ফুটাইয়া তুলি।

মানুষের কর্ম্মের মধ্যে, ইন্দ্রিয়খেলার মধ্যে একটা সত্য আছে—তাহাও তত্ত্ব। উহা যে মানুষের আত্মার কথা, অন্তরতম কথা নয় এমন নহে। রোমিও-জুলিয়েতে যে যুবজনোচিত প্রেমবহ্নি, আন্তনী-ক্লিওপাত্রায় যে তীব্র কামবহ্নি তাহা কি সত্যবস্তু নয়, আত্মার বিচিত্র লীলার অঙ্গীভূত নয়? তাহা কি সনাতন সত্যই নয়? বলা হইয়া থাকে, বর্ত্তমান কালে সভ্যতার যুগে রোমিও-জুলিয়েতের আন্তনী-ক্লিওপাত্রার স্থান নাই—তাহাদের ভাবে আর-কেহ পরিচালিত হয় না, মার্জ্জিতবৃত্তি মানুষ সে সকলের উচ্চে উঠিয়াছে, তাহারা সনাতন সত্য নহে। প্রথমত, এ কথাটি আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আমরা ত দেখি যুবকযুবতী যে ভাবে চিরকাল প্রেম করিয়া আসিয়াছে, আজও যে ভাবে করিতেছে, সকল বাহ্য সভ্যতা ভব্যতার অন্তরালে রহিয়াছে সেই পরিচিত পুরাতন রোমিও-জুলিয়েত। তবে রোমিও-জুলিয়েতে সে ভাব যেমন তীব্র, যেমন সুস্পষ্ট, যেমন স্থূলস্পর্শী ঠিক তেমন নয়, কিন্তু মূলত উভয় একই জিনিষ। উভয়ের মধ্যে এই পার্থক্যটি বরং থাকিবার কথা। কারণ কবি বাস্তবের নকল করিয়া চিত্র অঙ্কিত করেন না। বাস্তবের মধ্যে যে সত্য অস্ফুট, মৃদুগতি, অলক্ষ্যচারী তাহাকে পূর্ণ, স্পষ্ট,

জাজ্বল্যমান করিয়া দেখানই কবিত্ব। প্রকৃতপক্ষে সনাতন অর্থ এরূপ নয় চিরকাল যাহাকে বাস্তবে পূর্ণ প্রকটিত দেখিতে পাই। সনাতন অর্থ যাহা রহিয়াছে চিরকাল কিন্তু অন্তরালে, বাহিরে তাহার পূর্ণ প্রকাশ কখন হয়, কখন হয় না, কিন্তু প্রায়শই তাহার একটা ছায়া প্রসারিত থাকে। কবির, ঋষির প্রয়োজন এই গুহ্যগত গুপ্তকে টানিয়া গোচর করিয়া ধরা। আর এমনও যদি স্বীকার করা যায় যে মানুষ একদিন ইন্দ্রিয়বিক্ষোভ ছাড়াইয়া উঠিবে, আন্তনী-ক্লিওপাত্রার ছায়াও যেদিন জগতে পড়িবে না, তবুও সেদিন শেক্সপীয়রের মূল্য যে থাকিবে না এমন নয়, তিনি যে তত্ত্ব যে সত্য দেখিয়াছেন তাহা অসত্য হইয়া পড়িবে না। শেক্সপীয়র পড়িয়া সেদিন যে কেহ আনন্দ পাইবে না তাহা নয়। দেবভাবে সিদ্ধ প্রাচীন ঋষিগণ যে কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন আমরা তাহার ত কবিত্বের রস গ্রহণ করিতে পারি, অথচ আমরা দেবজন্ম কিছু পাইয়াছি কি? সেই রকম ইন্দ্রিয়ের আবিলতা হইতে মুক্ত হইয়া আমরা সেই আবিলতামূলক কাব্যের রস গ্রহণ করিতে যে পারিব না এমন নহে। বলা যাইতে পারে, বেদ উপনিষদের কবিত্ব যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি বা তদ্রূপ কিছু সৃষ্টি করিতে পারি, তাহার কারণ বর্ত্তমানের অশুদ্ধ অসিদ্ধ অবস্থাতেও আমাদের মধ্যে এমন একটি বৃত্তি বিকশিত আছে যাহার সাহায্যে সেই দেবলোকের সহিত আমরা সংশ্লিষ্ট। উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইন্দ্রিয়বিক্ষোভের অতীত হইলেই যে ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইয়া পড়িব তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? আর-সব বন্ধন ছিন্ন হইলেও অন্ততপক্ষে সৌন্দর্য্যবোধ, রসবোধের বন্ধন যে থাকিবে না তাহা কে জোর করিয়া বলিবে?

মানবজাতির ক্রমোন্নতি বলিয়া যে জিনিষটি বর্ত্তমান যুগের কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার অর্থ এরূপ নয় যে মানুষ যতই ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতর স্তরে উঠিতে থাকিবে, নিম্নস্তরের বৃত্তিগুলি ততই সে নিঃশেষে

ঝাড়িয়া ফেলিবে। মানুষ যদি দেবতা হয় তবে তাহার মধ্যে মানুষভাব এমন কি পশুভাবেরও যে স্থান হইবে না তাহা নয়। দেবচরিত্র আমরা গঠন করিতে চাই যে ভব্যতা শীলতা ইন্দ্রিয়বৃত্তির গতিমান্দ্য দ্বারা বাস্তবে তাহা কতদূর পরিণত হইবে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি না। আমরা মহাপুরুষের যে সংজ্ঞা দিয়াছি যিনি অন্তরে বাহিরে শান্ত ধীর, সকল উগ্রতা তীক্ষ্ণতা বিহীন, ইন্দ্রিয়খেলার অতীত, তিনিই শুধু মহাপুরুষ, আর কেহ নয়—এ কথাও দ্বিধাশূন্য হইয়া কে বলিতে সাহস করিবে ?

কিন্তু সে যাহাই হউক কবিত্ববোধ, কাব্যসৃষ্টির সহিত এ-সকলের কোন সম্বন্ধ নাই। মানুষ পশু হউক, দেবতা হউক, জগৎ সেণ্ট ফ্রান্সিসে ভরিয়া যাউক অথবা হূনদিগের আবাসভূমি হউক, কবির তাহাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। মানুষ নিরক্ষর অসভ্য বর্ব্বর, প্রকৃতিরই কোলের সন্তান হউক, অথবা সে জ্ঞানে বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্যে মহীয়ান হউক, কবি তাহা দেখেন না। সর্ব্বত্র সকলের মধ্যে কি গভীর সনাতন সত্য, কি পরম সৌন্দর্য্য ঐশ্বরিকশক্তিবৎ সকলকে চালাইয়া লইয়াছে তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া দেখানই কবির উদ্দেশ্য। কবির মধ্যে বর্ত্তমান যুগে আমরা চাহিতেছি culture অর্থাৎ মার্জ্জিত বিচারবুদ্ধি। কিন্তু যে culture শুধু চায় বিদ্যা অথবা পাণ্ডিত্য, ডারুইনের 'তত্ত্ব'টি জানাই যাহার প্রধান অঙ্গ, সে culture ব্যতিরেকে কবির মহত্ত্ব যে কিছু হীন হইয়া পড়ে তাহা নয়। দর্শন বিজ্ঞানে পারদর্শিতা কবিত্বের উৎস নয়। কাব্যজগতের এ-সকল অবান্তর কথা। কবি যে তত্ত্ব দেখাইতে চাহেন সেজন্য এ-সকল সাহায্য লইতেও পারেন, নাও পারেন। ভর্জ্জিল গ্রীককর্ত্তৃক ট্রয়নগর অধিকার যে ভাবে বিবৃত করিয়াছেন তাহা হইতে এমন প্রমাণিত হয় না বটে যে তিনি সমরনীতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সেইজন্য 'এনিদ' কাব্যের কবিত্বের কিছু অপচয় হইয়াছে কি ? দান্তের

স্বর্গ-নরক এঞ্জেল-শয়তান প্রভৃতি সম্বন্ধে কি অদ্ভুত ধারণা ছিল, কিন্তু জ্ঞানালোকদীপ্ত আধুনিক জগতে কয়খানি 'দিভিনা কমেদিয়া' সৃষ্ট হইয়াছে ? বস্তুত কি moral value, কি intellectual value দ্বারা কবিত্বের মহত্ত্ব স্থিরীকৃত হয় না। কারণ কাব্যের তত্ত্ব intellectual তত্ত্বও নয়, moral তত্ত্বও নয়। কাব্যের তত্ত্ব হইতেছে বস্তুর গুণ অথবা character. বুদ্ধির সত্য-অসত্য, নীতিবোধের ভাল-মন্দ অপেক্ষা গভীরতর পদার্থ হইতেছে, বস্তুর প্রকৃতি বা স্বভাব, প্রাণে characterএ যাহা অনুস্যূত হইয়া গিয়াছে। স্থূলে এই স্বভাবজ গুণের যে স্থূল বিক্ষোভ তাহা আত্মারই মূর্ত্ত প্রকাশ। আমরা যাহাকে passion বলিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করি তাহা আর কিছুই নয়, তাহা আত্মার গুণের পূর্ণ জাগ্রত জীবন্ত দ্যোতনা। তাই যাহাকে ইন্দ্রিয়গত, এই passion করিয়া তুলিতে না পারি তাহা কাব্যের বিষয় হইতে পারে না। আর যাহাকেই passionএ পরিণত করিতে পারি, তাহাই যথার্থ সৃষ্টি, তাহাই যথার্থ কবিত্ব।

কবির লক্ষ্য সেই তত্ত্ব যাহা শুধু চিন্তাগ্রাহ্য ধ্যানগত নহে কিন্তু যাহা আবার শক্তিপূর্ণ, যাহা বস্তুসৃজনক্ষম—বৈদিক ঋষিগণের ভাষায়, যাহা যুগপৎ সত্য ও ঋত। তত্ত্বকে যখন ঋতময় করিয়া অনুভব করি তখনই কেবল তাহার কবিত্বরসের সন্ধান পাই। বস্তুর মধ্যে যন্ত্রীবৎ সমারূঢ় যে নৈসর্গিক শক্তি, যে মৌলিক প্রেরণা, তাহারই বলে কবি প্রকৃত তত্ত্ব সৃষ্টি করেন, সে তত্ত্ব যেখানেই থাকুক না কেন—ধর্ম্মে-অধর্ম্মে পাপে-পুণ্যে জ্ঞানে-অজ্ঞানে। তত্ত্বকে যিনি এইভাবে দেখেন তাঁহাকে আর শুধু দার্শনিকের মত বিশ্লেষণ করিয়া তত্ত্বকে বুঝাইতে হয় না—তত্ত্বের এক স্থূল মূর্ত্তি দিয়া, কর্ম্মজগতে তাহার লীলাভঙ্গী অঙ্কিত করিয়াই তত্ত্বের সকল রহস্য অতি সহজে গোচর করিয়া প্রকটিত করেন। অন্তরের খেলাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখাইতে হইলে বাহিরের খেলাকে যে সূক্ষ্মতর

করিয়া আনিতেই হইবে এমন বাধ্যবাধকতা নাই। এ বাধ্যবাধকতা তখনই আসে যখন ঋষিকবির ঋতপূর্ণ দৃষ্টির পরিবর্ত্তে দার্শনিকের বিচার-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করি। বালজাকের (Balzac) ন্যায় মনস্তত্ত্ববিৎ কয়জন ঔপন্যাসিক আছেন? কিন্তু দেখ তাঁহার Père Goriot; মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে কি স্থাণু পাষাণে খোদিত বিরাট মূর্ত্তি তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন। শুধু ভাবজগতে মনোবিজ্ঞানের কারুকার্য্য, চাতুর্য্য, চমৎকারিত্বই তাহাতে নাই, কিন্তু একটা বাস্তব, জীবন্ত, রক্তমাংসের শরীরই তিনি সৃজন করিয়াছেন। আর শেক্সপীয়রের হ্যাম্‌লেট—তাহাতে যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ রহিয়াছে, বুদ্ধির ভাষায় চুল চুল করিয়া কে তাহা নিঃশেষ করিয়া দেখাইবে? অথচ, কিম্বা সেইজন্যই, কি জ্বলন্ত জীবন্ত তত্ত্ব এই হ্যাম্‌লেট—তাহার প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গীরই মধ্য দিয়া কি গভীর সত্য, কি তত্ত্ব যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে।

প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান কালে আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে কবিত্বের প্রধান কথা হইতেছে শক্তি, সত্যের মৌলিক শক্তি, সত্য-অনুভূতির সহজ অদম্য প্রেরণা। কবিতা সূক্ষ্ম হইতে পারে, গভীর হইতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে এবং প্রধানতই powerful হওয়া প্রয়োজন, এ কথাটি আমরা আর কাহারও মুখে বড় শুনিতে পাই নাই। বাল্মীকি হোমরকে আমরা নাম দিয়াছি primitive poets—অর্থাৎ আদিম প্রকৃতির। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা primitive ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন primary; আদিম প্রকৃতির নয়, আদি প্রকৃতির। তাঁহাদের কবিত্বের উৎস ছিল একটা elemental force, যাহার বলে সত্যকে বিদীর্ণ করিয়া তাঁহারা অন্তরের রহস্য মহিমামণ্ডিত করিয়া স্থূলে প্রকটিত করিতে পারিয়াছেন। কবিত্বের এই মূল সত্যশক্তি—বেদ যাহার নাম দিয়াছেন 'কবিক্রতু'—সৃষ্টির ইহাই একমাত্র প্রসূতি। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমরা প্রতিষ্ঠা

করিতেছি ভাবগত শোভনতা, চিন্তাবৃত্তির কারুকার্য্য। ফলে কাব্যজগতে বর্ত্তমান কালে সর্ব্বত্র নিপুণ কারিকর পাইতেছি, কিন্তু কোথাও সেই ঈশ্বরভাবপরিপ্লুত স্রষ্টার সাক্ষাৎ পাই না।

উপনিষদের কবি নিছক তত্ত্বকথা লইয়াই কাব্যসৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা আধুনিক বিশ্লেষণপরায়ণ মনস্তত্ত্ববিদগণের মত এই তত্ত্বকথার ব্যাখ্যা দেন নাই। তাঁহারা শেক্সপীয়র অথবা কালিদাসের মতনই 'কবিক্রতু', দৃষ্টির তপঃশক্তি, তীব্র passionএর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই তাঁহাদের সৃষ্টি এত অগ্নিময়, এত স্ফুট, এত বস্তুতন্ত্র। শেক্সপীয়র ও উপনিষদের ঋষিগণের মধ্যে আর যে দিক হইতে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, উভয়ের কবিত্ব-প্রতিভার উৎস এক স্থান হইতে, তাহাদের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈষম্য নাই। পার্থক্য যাহা তাহা বিষয়ের, আখ্যানবস্তুর মধ্যে, কিন্তু যে কবিত্ব-প্রেরণা উভয়কে পরিচালিত করিয়াছে তাহা একই প্রকার। ঋষিগণ দেখাইয়াছেন অধ্যাত্মতত্ত্ব, শেক্সপীয়র দেখাইয়াছেন ইন্দ্রিয়তত্ত্ব—উভয়ই তত্ত্ব, কিন্তু কোনটিই দার্শনিকতত্ত্ব নয়। তাই শেক্সপীয়র যখন বলিতেছেন

And in this harsh world draw thy breath in pain—

আর উপনিষদ যখন বলিতেছেন

বেদাহমেতং পুরুষমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তৎ

তখন চিন্তাগত না হউক কিন্তু কবিত্বগত একটা গভীর ঐক্যই অনুভব করি।

নারায়ণ : ভাদ্র, ১৩২৩

প্রতিভার কথা

প্রতিভার কাজে সকলের আগে যে জিনিষটি চোখে লাগে তাহা হইতেছে নূতনত্ব, মৌলিকতা। মানুষ সাধারণত চলে, চলিতে পারে একটা ধরাবাঁধা পথে। প্রথাগত, সকলের অভ্যস্ত যে চিন্তা, যে কর্ম্ম তাহারও সেই চিন্তা, সেই কর্ম্ম এবং চিন্তা ও কর্ম্মের সেই একই পদ্ধতি। এমন কি তাহার অনুভব, তাহার হৃদয়াবেগও সকল সময় তাহার নিজের নয় —অপরের মধ্যে চারিদিকের আবহাওয়ায় যে অনুভব, যে আবেগ খেলিতেছে তাহারই প্রতিধ্বনি মাত্র। জগৎ জুড়িয়া ভাবের, চিন্তার, কর্ম্মের যে একটা স্রোত ছুটিয়া চলিয়াছে সে তাহারই মধ্যে একটা অসহায় ঢেউ। অথবা সে যেন একখানা নিথর নিষ্ক্রিয় দর্পণ, তার কাজ তাহাকেই শুধু প্রতিফলিত প্রতিবিম্বিত করিয়া ধরা। কিন্তু প্রতিভার বিশেষত্ব এইখানে যে তিনি সংস্কারের, গতানুগতিকের গড্ডালিকাপ্রবাহের বহির্ভূত একটা পদার্থ। সনাতনের মধ্যে তিনি লইয়া আসেন অভূতপূর্ব্ব, পরিচিত বিধিবিন্যাসের মধ্যে আনিয়া ফেলেন কি এক বেখাপ জিনিষ। জগৎস্রোতে তিনি গা ভাসাইয়া দিয়া চলেন না, তাহার মধ্যে তিনি খাড়া হইয়া উঠেন, সেখানে তুলিয়া দেন বিপ্লব, হয়ত বা সে স্রোতকে ঠেলিয়া অন্য পথেই লইয়া চলেন।

এই নূতনত্ব জিনিষটি কি, ইহার মূল কোথায়? আমাদের দেশে প্রতিভাকে বলা হইয়াছে 'নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি'—যে বুদ্ধি নিত্য নূতন জ্ঞান বিকশিত করে, নূতন তথ্য বহিয়া আনে। কিন্তু ইহা প্রতিভার একটা দিক মাত্র। প্রতিভা সেই জ্ঞান সেই তথ্যের আস্বাদ, যে জ্ঞান যে তথ্য সৃজনক্ষম, যাহার প্রেরণা হইতেছে একটা কিছু গড়িয়া

তোলা, তাহাকে শরীর দেওয়া, জীবন্ত করা, অর্থাৎ যে জ্ঞান শক্তির আধার। জ্ঞানের মধ্যে যে বস্তু প্রতিফলিত, শক্তির মধ্যে তাহাকে মূর্ত্ত, বাস্তব, প্রাণবন্ত করিয়া ধরাই প্রতিভার সবখানি—ইহাই সৃজনের অর্থ। আর প্রকৃত সৃজন যাহা তাহা নূতনেরই সৃজন ; পুরাতনকে সৃজন করা, এ কথার অর্থ নাই।

পাশ্চাত্যে প্রতিভা ও গুণীর (genius ও talent) মধ্যে একটা পার্থক্যের কথা প্রায়ই নির্দ্দেশ করা হয়। সে পার্থক্যটি কি? আমরা বলিয়াছি প্রতিভার কাজ হইতেছে নূতন সৃজন। কিন্তু গুণীর কাজ নূতন সৃজন করা ততখানি নয়, যতখানি নূতন করিয়া সাজান। যাহা আছে, যাহা অভ্যস্ত পরিচিত তাহাকেই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, তাহার বিন্যাসের ধারাটি পরিবর্ত্তিত করিয়া এমনভাবে ধরা, যেন মনে হয় উহা একটি সম্পূর্ণ নূতন জিনিষই। যে উপকরণ দেওয়া আছে তাহার সমাবেশ-কৌশলেই গুণীর গুণ। বস্তুকে বিষয়কে উপকরণকে সে বদলাইতে চায় না, বা বদলাইতে পারে না। আবশ্যকীয় সামগ্রীসব তাহার কাছে ধরিয়া দাও, সে বুঝিয়া মাপিয়া চারিদিক দেখিয়া-শুনিয়া একটা যথাযোগ্য নূতন ধরণেরই জিনিষ খাড়া করিবে। কিন্তু প্রতিভার যে নূতনত্ব তাহা সম্পূর্ণ আর-এক রকমের—মনে হয় সে যেন সব ভাঙিয়া-চুরিয়া একেবারে গোড়া হইতে পত্তন করিয়াছে। গুণীর হইতেছে কৌশল, প্রতিভার হইতেছে শক্তি। তাই প্রতিভার মধ্যে যে শুধু নূতনত্বই পাই তাহা নয়, সেখানে পাই একটা মহত্ত্ব, বিরাটত্ব, অলৌকিকত্ব। আর সেইজন্যই দেখি, গুণী যিনি তাঁহাকে তাঁহার নিজের দেশ, তাঁহার সমসাময়িক কাল সহজেই বুঝিতে পারে, আয়ত্ত করিতে পারে। কারণ, তিনি উহাদের ফল, অন্যূনপক্ষে প্রতিনিধি মাত্র—সর্ব্বসাধারণ তাঁহাকে নিকটতর, একই স্তরের বলিয়া অনুভব করে। কিন্তু প্রতিভা যেন আর-একটি লোকের, তাঁহাকে বুঝিতে ধরিতে হইলে যাওয়া চাই দূরে—পরদেশে, উত্তরকালে।

অন্যদিকে দেখি গুণীর কাজ সময়ের সাথে কেমন মলিন হইয়া উঠে, তাঁহার প্রভাব বিশেষত নির্দ্দিষ্ট দেশের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু প্রতিভার প্রভাব দিনে দিনে উজ্জ্বল হইয়া চলে, সমস্ত পৃথিবীই তাঁহাকে আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করে। গুণীকে বিশেষভাবে চালাইয়া লইয়াছে যুগধর্ম্ম, কিন্তু বিশ্বের চিরন্তনের কি একটা নিত্যনূতন সার্থকতাই হইতেছে প্রতিভার প্রাণ।

অন্য কথায় আমরা বলিব, গুণীর মধ্যে প্রধান হইতেছে বুদ্ধি। আর বুদ্ধিই হইতেছে কারিগরী, শিল্পীর বৃত্তি। কিন্তু প্রতিভার মধ্যে, যেমন নেপোলিয়নে বা শেক্সপীয়রে, এই কারিগরের বৃত্তি কেমন নীচে পড়িয়া রহিয়াছে, উহা পরিচালিত আর-একটা মহত্তর বৃত্তির দ্বারা। বুদ্ধির ধর্ম্ম হইতেছে বস্তুর রূপটি লইয়া খেলা। বুদ্ধি জিনিষকে ধরে, অধিকার করে জিনিষের একটা বাহিরের অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া। সে ঘুরিয়া বেড়ায় জিনিষের চারিপাশে, সে একটা নূতন দিক দেখিলেও দেখিতে পারে কিন্তু সে নূতনত্বে পাই না স্থাণুত্ব, অতলস্পর্শতা। প্রতিভা কিন্তু বাহিরের প্রকাশের মধ্যেই আপনাকে বাঁধিয়া রাখেন না, সে-সকল অতিক্রম করিয়া তিনি চলিয়া যান একেবারে স্বরূপে, অন্তরাত্মায়। তাই বস্তুর উপর তাঁহার এমন সহজ অধিকার, অটুট প্রভুত্ব; সৃজনেও তাঁহার নৈসর্গিক ক্ষমতা। অবশ্য সর্ব্বসাধারণ যে বুদ্ধি লইয়া চলে, গুণীর ঠিক সেই বুদ্ধি নয়। গুণী চলেন একটা শুদ্ধ বুদ্ধি লইয়া, তিনি একান্ত বাহ্য রূপই দেখেন না—তিনি দেখেন গুণ, তাই তাঁহার নাম গুণী। কিন্তু গুণও জিনিষের ভিতরের, অন্তরতম, আত্মার কথা নয়।

মানুষের সাধারণ বুদ্ধি—তাহার প্রতীতি, প্রেরণা, হৃদয়াবেগ খেলিতেছে প্রকৃতির এপারের ভঙ্গীটি লইয়া। গুণীর যে বিশুদ্ধ বুদ্ধি তাহা এপারের শেষ সীমায় পৌঁছিলেও, তাহা এপারেরই। প্রতিভার প্রতিভা কিন্তু এইখানে যে তিনি এপারের এ গণ্ডী কাটাইয়া চলিয়া

গিয়াছেন ওপারে—অর্থাৎ শরীর প্রাণ ও মনের উপরে যে চতুর্থ বা তুরীয় লোক সেইখানে, যাহা সত্যের ও সৎ-এর, অব্যর্থ জ্ঞান ও অটুট সৃজনশক্তির প্রতিষ্ঠান, উপনিষদ যাহার নাম দিয়াছেন 'বিজ্ঞান'—বৃহৎ জ্ঞান—যেখানে হইতেছে দিব্যদৃষ্টি আর দিব্যশক্তি। ইহারই কিছু ঢালিয়া দিয়াছেন এপারের, এই শরীর প্রাণ ও মনের জগতের বস্তুরাশির উপর। এই বিজ্ঞান হইতেছে প্লেতোর সেই arche types—আইডিয়া বা ভাবের জগৎ, রূপময় সৃষ্টজগতের পশ্চাতে রহিয়াছে যে-সব স্বরূপ তাহাদের সমষ্টি। প্রতিভার মধ্যে জাগিয়া উঠে, প্রতিভাত হয় এই এক-একটি আইডিয়া মূলভাব, এই স্বরূপের এক-একটি নিগূঢ় সূক্ষ্ম বিগ্রহ এবং উহাকেই তিনি বাহিরে শরীরী করিয়া গোচর করিয়া ধরেন—সৃজন করেন। সৃষ্টির অর্থ ই হইতেছে এই তুরীয়ের মধ্যে অবস্থিত অগোচর অপ্রকাশ 'গুহাহিত' এক-একটা ভাবের শরীরগ্রহণের প্রয়াস। কারণ, এই তুরীয় বা বিজ্ঞান হইতেছে সেই-সব মৌলিক আদি সত্যের অধিষ্ঠান যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বর স্বয়ং এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাদিগকে ক্রমবিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া স্ফুট জাগ্রত করিয়া ধরিতেছেন। প্রতিভার মধ্যে এই ঐশ্বরিক শক্তিই খেলিয়াছে, ইহারই জোরে তাঁহারও সৃষ্টি চলিয়াছে। প্রতিভার প্রতিভা যে সৃজনশক্তি লইয়া, তাহার কারণও এইখানে। প্রতিভার ধাম যে বিজ্ঞানলোক তাহা জ্ঞান ও শক্তির সমন্বয়—সমন্বয় শুধু নয়, সম্মিলন। ইহা হইতেছে তপঃ অর্থাৎ মূল জ্ঞানের সহজ-বিচ্ছুরিত শক্তি—চিৎশক্তি। বুদ্ধির সাথেও একটা যে শক্তি—ইচ্ছাশক্তি—নাই তাহা নয়। কিন্তু সেখানে উভয়ের মধ্যে আছে সহচরের সতীর্থের সম্বন্ধ, সেখানে উভয়কে টানিয়া আনিয়া মিলাইয়া ধরিতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানে জ্ঞান ও শক্তি একই ; চিৎশক্তির অপর নামই তপঃশক্তি।

কিন্তু শুধু নূতনত্বও নয়, শুধু সৃজনও নয়, প্রতিভার সাথে সচরাচর

আর-একটি জিনিষ নিত্যসঙ্গীরূপে আমরা জুড়িয়া দিয়া থাকি—তাহা হইতেছে সহজ সৃজন, শক্তির অবাধ আয়াসহীন বিকাশ। প্রতিভার কাজ ভগবানেরই মত। God said, let there be light, and there was light—প্রতিভার মধ্যেও আমরা সর্ব্বদাই যেন এই রকম একটা অনায়াস-প্রভুত্ব দেখিতে পাই। তুমি-আমি যদি সামান্যও একটা-কিছু করিতে চাই, তবে কত চেষ্টা, কত শ্রম, কত গলদ্‌ঘর্ম্ম, তার পরেও সিদ্ধি হয় কি না সন্দেহ। প্রতিভার কিন্তু এই রকম প্রতি পদে প্রাণান্ত হইতে হয় না। তাঁহার কর্ম্ম মানুষীচেষ্টার ফল নয়, দিব্যপ্রসাদবলে তিনি নিত্যসিদ্ধ। তাই আমরা বলিয়া থাকি, কবি যিনি তিনি জন্ম হইতেই কবি, চেষ্টা করিয়া কেহ কবি হইতে পারে না। প্রতিভাবান সিদ্ধকর্ম্মীর নিকট হইতেও আমরা আশা করি সেই সফলতা যাহার জন্য কোন যুদ্ধ করিতে হয় নাই, সেই বিজয় যাহা পরাজয় কাহাকে বলে জানেও নাই। ক্রৌঞ্চমিথুনের সে করুণ দৃশ্যটি চোখে পড়িবামাত্র বাল্মীকির কবিত্বপ্রতিভা অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল আর রামায়ণ রচিত হইয়া গেল। আলেকসান্দরের সমস্ত জীবন একটানা বিজয়। নেপোলিয়ন সেই দিন প্রথম হটিতে আরম্ভ করিলেন, যে দিন তাঁহার প্রতিভা তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল।

কিন্তু এ কথাটি কতখানি সত্য? প্রতিভাকেও কি কখন কখন কঠোর সাধনা, ঘোর পরিশ্রমের মধ্য দিয়াই চলিতে হয় নাই—সাধারণ লোকেরই মত যুদ্ধ সংঘর্ষ, এমন কি পরাজয় পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হয় নাই? শুধু চেষ্টা করিয়া কেহ কবি হইতে পারে না, সত্য কথা। কিন্তু সে জন্য কি বলা যায় যে কবি হইতে গেলে চেষ্টার প্রয়োজনই নাই? ঘটে যাহা নাই, তাহা পটেও নাই—কিন্তু ঘটে যাহা আছে তাহাকে পটে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে কোথাও যে যত্ন বা চেষ্টার দরকার হয় না, এমন নয়।

প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে, প্রতিভাও আছে দুই শ্রেণীর। এক, যাঁহাদিগকে তেমন কৃচ্ছ্র সাধনার মধ্য দিয়া যাইতে হয় নাই, যাঁহারা কেমন অবলীলাক্রমে হাসিতে হাসিতেই যেন পাহাড় পর্ব্বত হটাইয়া চলিয়াছেন, গহন অরণ্যের স্থলে এক মুহূর্ত্তে ইন্দ্রপুরী রচিয়া দিয়াছেন। আর, যাঁহারা চলিয়াছেন যেন সাধারণ মানুষের মত ধীরে ধীরে, পদে পদে যুদ্ধ করিয়া, পঞ্চাগ্নির তাপে পুড়িয়া পুড়িয়া। এক দিকে শেক্সপীয়র, আর-এক দিকে বাল্‌জাক। যে প্রতিভাকে আমাদের মতনই পরিশ্রম করিতে হইয়াছে দেখিতেছি, তাঁহাকে নিম্নতর শ্রেণীর বলিয়া মনে হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। কারণ মূল শক্তিটি উভয়ের মধ্যে একই, তারতম্য শুধু বিকাশের প্রণালীতে। দুইজনেই চলিয়াছেন বিজ্ঞানের—সেই তুরীয়ের শক্তির প্রেরণায়; তবে একজন গোড়া হইতেই সে শক্তি পূর্ণ অধিকার করিয়াছেন, আর-একজন একটা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিয়া সে শক্তি পাইয়াছেন। দুইজনকেই জন্মসিদ্ধ বলা যাইতে পারে—একজনের সিদ্ধি প্রথম হইতে বা অকস্মাৎ ফুটিয়াছে, আর-একজনে তাহা ক্রমবিকশিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

কিন্তু এ কথাও বলা বোধ হয় একেবারে নির্ভুল নয় যে, প্রথমোক্ত শ্রেণীর প্রতিভায় কোন দ্বন্দ্ব, কোন সাধনা, কোন পরাজয়ের বা সন্দেহের ইঙ্গিত, কোন কৃচ্ছ্রতাই কিছু নাই। বরং তাঁহাদের অন্তরাত্মা যদি দেখিতে পাইতাম তবে হয়ত বুঝিতাম কি একটা গভীর কঠোর তপস্যা ঝড়ের মত তাঁহাদের ভিতরে বহিয়া গিয়াছে। প্রভেদ শুধু এইখানে, একজনের সাধনা হইয়াছে ক্ষিপ্রগতিতে—সে সাধনপ্রণালী অব্যক্ত, সংহত, একটা involved process; আর-একজনের সাধনা চলিয়াছে ব্যক্ত-ভাবে, ধাপের পর ধাপে। কিন্তু যে সাধনা যত সংহত কেন্দ্রীকৃত দ্রুত তাহার বেদনাও কি ততই তীব্র নয়? এমন যে শেক্সপীয়র—যাঁহার সৃজন এমন সহজ, এমন স্বতঃ-উৎসারিত, এমন অনর্গল উচ্ছ্বসিত, যাঁহার কোন

কথার ভঙ্গিমায় প্রয়াসের পরিশ্রমের লেশমাত্র চিহ্ন পাই না, তিনিও দেখি প্রায় চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিতেছেন—

Where art thou, Muse, that thou forget'st so long—
Return, forgetful Muse, and straight redeem
In gentle numbers time so idly spent—

বস্তুত, যে শেক্সপীয়র ভিনস ও আদোনিস লিখিয়াছেন, আর যে শেক্সপীয়র হ্যামলেট লিখিয়াছেন, এই তুইএর মধ্যে যে ব্যবধান তাহা শিল্পীহৃদয়ের কত দ্বন্দ্ব কত দ্বৈধ কত কষ্ট কত যত্নের ইতিহাসে যে পরিপূর্ণ সে কথাটি জানা না থাকিলেও তাহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হইয়া আমরা পারি না।

শুধু তাহাই নয়, আমরা বলিব এই চেষ্টা, এই কৃচ্ছ্রসাধনা—তাহা গুপ্ত হউক আর ব্যক্ত হউক—এই তপস্যাই প্রতিভাকে মণ্ডিত করিয়াছে একটা নিজস্ব বিশেষ আভায়। ইহা সকল প্রতিভার মধ্যেই আছে—যাঁহার মধ্যে এই তপশ্চর্য্যা সুস্পষ্ট তাঁহার মধ্যেও আছে, আর যাঁহার মধ্যে সুস্পষ্ট নয় তাঁহার মধ্যেও আছে। শেক্সপীয়র বা বাল্মীকির মধ্যেও আছে, আবার গ্যেতে বা ব্যাসের মধ্যেও আছে। স্ফুটভাবে আর অস্ফুটভাবে হউক, আছে তপঃশক্তির কেমন এক রৌদ্রভাব, একটা আত্মস্থ সংহত সামর্থ্য, একটা পুরুষোচিত দৃঢ়তা। একটা কঠিন সাধনা, আত্মদ্বন্দ্বই প্রতিভার শক্তিকে কেমন জমাট নিরেট একাগ্র করিয়া ধরিয়াছে; শাণিত তরবারি-ফলকের ন্যায় এক দিকে সে যেমন নমনীয়, অন্য দিকে তেমনি সে নমনীয়তার সাথে-সাথেই কেমন কাঠিন্যে ভরা। প্রতিভার উৎসই ত সেই বিজ্ঞানলোক, যেখানে তপঃশক্তি কেন্দ্রীভূত, আপন পূর্ণ বিশুদ্ধ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। সঃ তপস্তপ্ত্বা বিশ্বমসৃজত—প্রতিভাও যে সৃজন করিতেছেন এই রকম তপস্যার তাপে তপঃশক্তিকে ফুটাইয়া তুলিয়া। এই তপঃশক্তি, এই তপস্যার তাপ যাঁহার নাই তাঁহার সৃজনশক্তিও নাই, তাঁহার প্রতিভাও সেই অনুপাতে বিশুদ্ধ পূর্ণ নহে।

তাই আমরা এমন অনেককে দেখিতে পাই যাঁহারা প্রতিভার একটা বীজ লইয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু সে প্রতিভাকে সুপক্ক ঋদ্ধ মহনীয় করিয়া তুলিতে পারেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে শক্তি খেলিয়াছে অতি সরল অতি সহজ প্রবাহে, নির্ব্বিবাদে। শক্তি সেখানে কোন বাধা পায় নাই, শক্তির রাশ টানিয়া রাখিতে তাঁহারা পারেন নাই, তাই সে জিনিষটি জমাট বাঁধিয়া সামর্থ্যে ভরপুর হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় নাই। অন্য কথায়, তাঁহারা চলিয়াছেন বেশীর ভাগ প্রাণের আবেগে, ভাবের উচ্ছ্বাসে। প্রাণের আবেগকে আদিশক্তির প্রেরণায়, ভাবের উচ্ছ্বাসকে স্থিতপ্রজ্ঞায় পরিণত করিতে পারেন নাই, তপোলোকে উঠিয়া গিয়া তথাকার দিব্য-ঈষণায় সৃজন করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাদের রহিয়া গিয়াছে কেমন চাপল্য, কেমন ভাসাভাসা চাকচিক্য—সত্যের ভাবের স্বরূপটি উন্মুক্ত করিয়া ধরিতে পারেন নাই। ফরাসী কবি ভিক্তর হিউগোর এই রকম একটা fatal facility—অতিসুলভ অনুপ্রেরণা ছিল, তাই এতখানি প্রতিভা সত্ত্বেও তাঁহার সৃষ্টি অসম্পূর্ণই থাকিয়া গিয়াছে। আর আমাদের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও যে এ কথা এক-একবার মনে না হয় এমন নয়। ইঁহাদের সাথে স্মরণ করা যাইতে পারে বাল্‌জাকের কথা। বাল্‌জাক যখন লিখিতে বসিতেন তখন তিনি খৃস্টীয় (রোমান কাথলিক) যতির পোষাক (soutane) পরিয়া তবে লিখিতেন; তিনি বলিতেন ভগবৎসেবার ন্যায় শিল্পসেবাতেও প্রয়োজন সন্ন্যাস, বৈরাগ্য, কৃচ্ছ্রসাধনা (asceticism)। প্রতিভার মধ্যে অবশ্য কষ্টকল্পনা নাই, সেখানে খুবই আছে সরলতা, কিন্তু সে সরলতাকে বলা যাইতে পারে—একজন ফরাসী সমালোচকের কথায়—facilité difficile—কষ্টসাধ্য সরলতা। বাহির হইতে দেখিলে প্রতিভার সৃষ্টিকে বোধ-হয় কেমন আঁটসাঁট, কোন ফাঁক নাই, কেমন নিটোল, অঙ্গে অঙ্গে কেমন সহজ সামঞ্জস্যে সম্মিলিত। কিন্তু ভিতর হইতে যে দেখিতেছে তাহার চক্ষে পড়িতেছে কতজায়গায় জোড়া

দেওয়া হইয়াছে, কত গ্রন্থি সেখানে রহিয়াছে—যত্নের প্রয়াসের কত রেখা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

পুরুষ অপেক্ষা নারীর মধ্যে প্রতিভার সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশটি যে এত বিরল তাহার কারণও বোধ হয় এইখানে। নারী চলে একটা সহজ অতিসুলভ আবেগের ভরে—ভাবিয়া-চিন্তিয়া নয়, বাদ-বিচার করিয়া নয়, বুদ্ধির জোরেও নয়, সে একটা অন্তরঙ্গ নৈসর্গিক প্রেরণা বটে—Intuition হয়ত অনেকে বলিবেন, বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু তাহা Intuition নয়, তাহা হইতেছে Instinct। নারীর মধ্যে পাই না পুরুষের আত্মস্থ তপঃশক্তি; ধ্যানীর যতির সেই একাগ্র স্ববশীভূত অথচ উদার প্রশান্ত শক্তির প্রয়োগ। অতিমাত্র নিজের অনুভব, অযত্নপ্রাপ্ত প্রতীতি, বাহ্যস্পর্শেরই একটা জাল, নারী নিজের চারিদিকে নিজে বুনিয়া চলে, তাহার মধ্যেই আপনাকে বাঁধিয়া রাখে। কিন্তু প্রতিভার, তুরীয় আবেগের মূলই হইতেছে নিজত্বের ব্যক্তিত্বের উপর শত জোর দেওয়া সত্ত্বেও নিজেকে ছাড়াইয়া যাওয়া, উদাসীন নির্লিপ্ত হইয়া একটা ভূমার বৃহতের বিশ্বের ভাবে ভরপুর হওয়া। নীট্শে যে নারীজাতিকে একটু তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখিতেন তাহাও এইজন্যই—প্রতিভার যে সর্ব্বোচ্চতম, যে চরম অদ্বিতীয় সৃষ্টি তাহা যেন নারীপ্রকৃতি দিয়া সম্ভব হয় না। শেক্সপীয়র, দান্তে, হোমর, বাল্মীকি—নারীজাতি ত এমন কাহাকেও দিতে পারে নাই। এ কথা অবশ্য বিশেষভাবে খাটে ভাবের বা চিন্তার জগৎ সম্বন্ধে। কিন্তু ভাব বা চিন্তার জগৎ অপেক্ষা নারীর প্রতিভা বেশী খেলে কর্ম্মের জগতে। কারণ, কর্ম্মের উৎস হইতেছে প্রাণে, আর নারীর মধ্যে যদি কিছু সজাগ সামর্থ্যে ভরপুর থাকে তাহা হইতেছে এই প্রাণ। আমরা বলিয়াছি প্রাণের আবেগ, উত্তেজনা প্রতিভার, তপঃশক্তির অন্তরায়। কিন্তু এক দিকে অন্তরায় হইলেও আর-এক দিকে আবার সহায়। প্রাণশক্তিরই উল্টা দিক, নিভৃত সত্তা

হইতেছে তপঃশক্তি—প্রাণশক্তি যেখানে সচল জীবন্ত সেখানে সে তপঃশক্তি ফুটিয়া উঠিবার সুবিধা পায়, যদিও তপঃশক্তি সব সময়ে একেবারে বিশুদ্ধ, আপনার স্বরূপ সত্তাটি লইয়া বিকশিত হয় না। তবুও—স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে। বস্তুত এই কর্ম্মজগতেই দেখি নারী-প্রতিভার যত মহীয়সী কীর্ত্তি। কবিশ্রেষ্ঠের মধ্যে যদি পাই এক সাফো (Sapho), কর্ম্মীশ্রেষ্ঠের মধ্যে পাই—সেমিরামিস, ক্লেওপাত্রা, জান দার্ক।

প্রতিভাবানের স্বভাবে একটি বিচিত্রতার উল্লেখ করা পরিশেষে প্রয়োজন মনে করি। কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহাতে আর পাগলে ধাতুগত কোন পার্থক্য নাই, উভয়ে একই পদার্থে গঠিত। কথাটি শুধুই রূপক বা অলঙ্কার নয়। আমরা সত্যসত্যই দেখি প্রতিভাবান কোথাও একেবারে উন্মাদ, নতুবা অদ্ভুত খামখেয়ালের বশবর্ত্তী। প্রায় সকলেরই মধ্যে বোধ করি কেমন মস্তিষ্কের স্থিরতা নাই, সেখানে কি একটা গোলমাল অসামঞ্জস্য দেখা দিতেছে। এ কথারও সদর্থ আমরা প্রতিভার যে ব্যাখ্যা দিয়াছি তাহা হইতেই পাই। আমরা বলিয়াছি, আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজন যে সামঞ্জস্যকে, যে নিয়মকে, যে 'ধর্ম্ম'কে (poise) সৃষ্টি করিয়াছে, মস্তিষ্কের বিচারবুদ্ধি যাহাকে স্পষ্ট স্ফুট অচল অটল করিয়া গাঁথিয়া তুলিয়াছে সে সামঞ্জস্যকে, সে নিয়মকে, সে ধর্ম্মকে প্রতিভা চাহেন না। তিনি তাহার পরিবর্ত্তে দিতে চাহেন আর-একটা ধর্ম্ম, আর এ জিনিসটি তিনি আহরণ করেন আর-একটা উত্তর জগৎ হইতে। তাই প্রচলিত অভ্যস্ত নিয়মের মধ্যে যিনি আপনাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, বিচারবুদ্ধির—যাহাকে আমরা বলি সুস্থির মতি, তাহার—যে বিধিবিন্যাস তাহাকে এতটুকু এড়াইয়া চলেন না, এমন ব্যক্তির মধ্যে সেই তুরীয়লোকের প্রেরণা যেন কোন প্রবেশের পথ পায় না, কি একটা কঠিন নিথর আবরণ যেন উহার সম্মুখে। কিন্তু যেখানে ধরাবাঁধার নিগড় তেমন নাই, যেখানে একটু বিশৃঙ্খলা, একটু

শিথিলতা, যেখানে একটু আত্মবিস্মৃতি, সেখানেই অতর্কিতের, আকস্মিকের স্থান, সেখানেই প্রতিভার প্রেরণা ফুটিয়া উঠিবার অবকাশ পাইয়াছে। তাই দেখি বদ্ধ পাগলের মধ্যেও অসাধারণ Intuition সব খেলে, শিশুর মুখেও শুনি দিব্যজ্ঞানের কথা। শুধু তাহাই নয়, অন্য দিকে আবার, প্রতিভার যে তুরীয় আবেগ তাহা এতই শক্তিমান, এতই অভাবনীয় অপ্রত্যাশিত অপরিচিত যে জগতের মধ্যে সে যেমন একটা আলোড়ন তুলিয়া দেয়, প্রতিভাবানের নিজের আধারকেও তেমনি বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে। আধার যে-সমস্ত জিনিসে অভ্যস্ত, তাহার যে-সব সংস্কার তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ নূতন মহান জিনিষ প্রতিভা লইয়া আসে—পুরাতন আধার এই নূতন আবেগকে সহজে ধারণ করিতে পারে না। তাই দেখি কোথাও সে আধার একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—যেমন, নীট্‌শে, কোথাও বা দেখি সেখানে ফাটল ধরিয়াছে—যেমন, ওয়াগ্‌নের। প্রতিভাশালীদের মধ্যে এই যে বাতুলতা হউক আর বাতিকই হউক যাহা দেখি তাহা হইতেছে ধারণসামর্থ্যের অভাব। মস্তিষ্ককে সুস্থির, বুদ্ধিকে অটল রাখিয়া, তুরীয়ের স্বাস্থ্যেই ভরিয়া উহাদিগকে যে গড়িয়া তুলা যায় না তাহা নয়; আধারকে জীবনকেও আবার একটা জাগ্রত স্ফুট স্থিরপ্রতিষ্ঠ সামঞ্জস্যে নিয়মে বিধৃত করা যায় —কিন্তু সে অভিনব স্বভাবের জন্য চাই অন্য এক রকম সাধনা।

প্রবাসী: ভাদ্র, ১৩২৫

শিল্পকলার কথা

প্রত্যেকটি কলাবিদ্যা আপনাতে আপনি পূর্ণ, কোনটি কোনটির অপেক্ষা রাখে না (sui generis); মানুষের অন্তরাত্মা হইতে সবগুলিই যুগপৎ ছুটিয়া বাহির হইয়াছে। যে প্রেরণার সার্থকতার জন্য সেই দিন মানুষের কণ্ঠে সুর দেখা দিল, সেই প্রেরণার সার্থকতার জন্য সেই দিনই তাহার হাতে উঠিল তুলিকা, বাটালি আর লেখনী। সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য্য আর কাব্য—মানুষের একই সৌন্দর্য্যবোধের সৃষ্টি—প্রত্যেকটিই আপন আপন ধরণে সেই সৌন্দর্য্যসৃষ্টির চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে; সকলেই সকলের সমান, 'কেহ নহে উন'। সুতরাং মোলিয়ের যে নৃত্যের ও সঙ্গীতের দুই ওস্তাদের মধ্যে একটা কলহের চিত্র দিয়াছেন (Le Bourgeois Gentilhomme) সেই রকম শিল্পীতে শিল্পীতে দ্বন্দ্ব করিবার কিছু নাই। তবে দ্বন্দ্ব যে সময়ে সময়ে দেখি, তাহার কারণ শিল্পীদের আপন আপন শিল্পটির উপর আত্যন্তিক অনুরাগ, তাঁহাদের সৌন্দর্য্যবোধের একদেশদর্শিতা।

ঐতিহাসিক হিসাবে বোধ হয় আগে-পরে নাই, ভিতরের সারবস্তুর মূল্য হিসাবেও বড়-ছোট নাই; তবুও তত্ত্বের দিক দিয়া, অন্তরাত্মার অভিব্যক্তির দিক দিয়া কলাবিদ্যাগুলিকে স্তরে স্তরে আমরা সাজাইতে পারি, গুণ কর্ম্ম হিসাবে তাহাদের মধ্যে একটা তারতম্য, অথবা তারতম্য যদি না বলিতে চাই তবে একটা ক্রম নির্দ্দেশ করিতে পারি। মূলত যেমন চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে আগে-পরে বা শ্রেয়-হেয় নাই অথচ সেখানেও একটা স্তরবিভাগ যেমন করা যায় বা আছে—অথবা যেমন দেহের পক্ষে মাথার ও পায়ের সমান প্রয়োজন, এমন কি সেই

প্রয়োজনীয়তা হিসাবে উভয়ের মর্য্যাদাও সমান অথচ মাথার স্থান মাথায় আর পায়ের স্থান পায়ে—সেই রকম শিল্পবিদ্যাসকল সমান্তরাল রেখায় চলে, এ কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও আমরা ন্যায্য ভাবেই দেখাইতে পারি যে সেখানে আছে উপরের বলিয়া রেখা, আর নিম্নের বা তলের রেখা।

ভিতরের অন্তরের উপলব্ধিতে পাওয়া একটি সত্যসুন্দরকে বাহিরে রূপ দিয়া সৃষ্টি করার নামই কলা, শিল্প বা আর্ট। আর্টে আর্টে পার্থক্য এই বাহিরের রূপের উপকরণ বা মালমসলার পার্থক্য। গায়ক সত্যসুন্দরকে রূপান্বিত করিতে চাহিতেছেন ধ্বনির, স্বরের সহায়ে; চিত্রকর চাহিতেছেন রংএর, রেখার সহায়ে; ভাস্কর চাহিয়াছেন কঠিন নিরেট বস্তু —পাথর; আর কবি চাহিয়াছেন মানুষের মুখের বাক্য বা কথা। কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেই ভিতরের সত্যসুন্দর। যে উপকরণের ভিতর দিয়াই হউক না কেন, যিনি যখনই সেই সত্যসুন্দরকে একটু জাগ্রত, জলন্ত করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন তিনিই ততবড় স্রষ্টা বা শিল্পী, এই হিসাবে সকল শিল্পের সমান মর্য্যাদা। বীথোবেন, রাফাএল, মাইকেল এঞ্জেলো আর শেক্সপীয়র সমানভাবে আমাদের আদরণীয় বরণীয় নমস্য।

কিন্তু উপকরণের পার্থক্য যদি শুধু উপকরণেরই পার্থক্যে আবদ্ধ থাকিত, সে পার্থক্য যদি আর কোন পার্থক্যকে সঙ্গে ডাকিয়া না আনিত, তবে ঐখানেই সকল কথার শেষ হইত। কার্য্যত দেখি উপকরণের ভিন্নতা আনিয়া দিয়াছে ভঙ্গীরও ভিন্নতা, আধারের ধরণধারণ তুলিয়া দিয়াছে আধেয়ের, সেই এক সত্যসুন্দরেরই মধ্যে এক-একটা বিশেষ ভাব বা প্রকরণ। অথবা অন্য দিক হইতে যদি আমরা দেখি তবে বলিতে পারি, ভিতরের উপলব্ধির একটা বিশেষ ভাব, অন্তরাত্মায় আবির্ভূত সত্যসুন্দরের একটা বিশেষ ধরণ শিল্পীকে বিশেষ বিশেষ ধারায় চালাইয়া লইয়াছে, তুলিয়া দিয়াছে এক এক শিল্পীর হাতে এক এক যন্ত্র। এখন আমরা বলিতে চাই এই অন্তরের ভাবে একটা ক্রম আছে, সেই

ক্রমানুসারেই শিল্পসমূহে একটা স্তরবিভাগ করা যাইতে পারে, মূলত যদিও সে ভাব হইতেছে এক অখণ্ড সাম্য-স্বরূপ।

সত্যসুন্দরের যে ভাবময় সত্তাটুকু, যে অরূপ রহস্যলাঞ্ছনা, যে অনন্ত দ্যোতনা সকল সীমা কাটিয়া মুছিয়া দিয়া কেবলই আপনাকে দূর হইতে দূরে ছড়াইয়া চলিয়াছে, গান তাহাই ফুটাইতে চাহিতেছে। সেই ভাবকে, অনির্দ্দেশ্য ইঙ্গিতকে, অসীম অরূপকে নির্দ্দিষ্ট অর্থের বিশেষ রূপের মধ্যে প্রথম ধরিতে চাহিল চিত্র; ভাস্কর তাহাকে আরও স্ফুট আরও স্পষ্ট, আমাদের এ জগতের স্থূলের কেবল আলো ছায়া রেখা রঙের বাহারে নয়, কিন্তু মাংসপেশীর মধ্য দিয়া যেন আমাদেরই মত শরীরী ও জীবন্ত করিয়া তুলিতে চাহিতেছে। কবি তাহাতেও সন্তুষ্ট নহেন, তিনি রূপের বিগ্রহের মুখ দিয়া আবার কথা ফুটাইতে চাহিতেছেন। গান যেন অন্ধ সেই অদেহী ঋষিবর; চিত্রে তাঁহার চক্ষু ফুটিয়াছে, দেহও দেখা দিয়াছে, কিন্তু সে দেহ এখনও সূক্ষ্ম দেহ; ভাস্কর্য্যে তিনি যেন তাঁহার স্থূল ভৌতিক দেহটি পাইয়াছেন। গান অন্ধ; চিত্র ও ভাস্কর্য্য অন্ধ না হইলেও মূক; মূক ঋষি কথা পাইয়াছেন, পূর্ণভাবে প্রকট হইয়াছেন কাব্যে। গান হইতেছে যেন যোগসমাধি, সে সমাধির উপলব্ধি ব্যুত্থানের পথে, যেন চিত্রে ভাস্কর্য্যে স্ফুটতর হইয়া ক্রমে কাব্যে পূর্ণ জাগ্রত হইয়া দেখা দিয়াছে।

আমরা বলিয়াছি আর্ট হইতেছে সত্যসুন্দরের সৃষ্টি, কিন্তু সৃষ্টির জন্য সৃষ্টির মূলে চাই একটা আবেগ, একটা নিবিড় চঞ্চলতা। সকল সত্তাই হইতেছে গতির সমষ্টি বা সংহতি। সত্যসুন্দরের অঙ্গে অঙ্গে যে লাবণ্যের ঢেউ উঠিয়াছে, সত্যসুন্দরের যে প্রাণতরঙ্গ তাহা যখন শিল্পীর প্রাণের উপর গিয়া আঘাত করে, তখনই শিল্পীর মধ্যে জাগিয়া উঠে তাঁহার সৃজন আবেগ বা স্পন্দন; এই গতিলাস্য হইতে উঠিয়াছে শব্দ, ধ্বনি, মূর্চ্ছনা। এই মূর্চ্ছনার যে সূক্ষ্ম স্বরূপ—অন্তরাত্মায় যে প্রথম স্পন্দন, প্রাণের নিভৃত সত্তায় যে কলগতি—তাহারই নাম নাদব্রহ্ম; উহার স্থূল রূপ বা পরিণতিই

হইতেছে শব্দ, ধ্বনি। স্থূল শব্দ বা ধ্বনির সহায়ে সঙ্গীত সেই নাদব্রহ্মকে প্রকট করিতেছে, সৃষ্টি করিতেছে—যে নাদব্রহ্ম আত্মার সাড়ার মৌলিক অভিব্যক্তি, আদিম উল্লাস। তাই গানই হইতেছে আদি আর্ট—সকল আর্টের প্রতিষ্ঠাতা। সত্যসুন্দরের সত্তায় যে মূর্চ্ছনা, গানে তাহারই নাম সুর। সুরই আর্টের গোড়ার কথা। কিন্তু সত্তার গতি মূর্চ্ছনাই সব নয়, মানুষ সত্যসুন্দরের সাগরের ঢেউয়ের শুধু কলরোল শুনিয়াই থামিয়া যাইতে চায় না। গতির আছে একটা ভঙ্গী একটা ধারা, তাহাকে রেখায় তুলিয়া দেখান যায়; তরঙ্গের গায়ে আছে একটা আবেগের রঙের খেলা, তাহাকে ফলাইয়া ধরা যায়। গতির একটা দিক, তাহার মূর্চ্ছনাটি আমরা কান পাতিয়া শুনিতে পারি; কিন্তু গতির আর-একটা দিক, তাহার রূপটি চক্ষু দিয়াও যে দেখিতে চাহি। প্রথমে নাম শুনা—পূর্ব্বরাগ

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

তারপর রূপ দেখা—অনুরাগ

মেঘ মালা সঙে তড়িত লতা জনু।

গানের পর তাই তখন ছবির জন্ম। গান দিতেছে সত্যসুন্দরের ভাবটুকু (ইংরাজিতে ইহাকে আমরা বলিতে পারি Intuition, আর ইহারই অন্য নাম 'শ্রুতি' নয় কি?)—এই ভাব হইতেছে যাহা অবাঙ্‌মনসগোচর, যাহা সূক্ষ্ম সাধারণ। কিন্তু ভাবের আছে একটা বিশেষ প্রকরণ (Ideation বা Imaging—ইহাই না 'স্মৃতি'?)—চিত্র চাহিতেছে এই জিনিষটি দেখাইতে, সূক্ষ্মকে সাধারণকে একটা স্থূলতর বিশেষ আধারের মধ্যে ধরিয়া দিতে। গান যেন সাধারণ সূত্র, আর চিত্র যেন তাহারই বিশেষ উদাহরণ। প্রথমে শ্রুতির বেদের তত্ত্ব, তারপর স্মৃতির পুরাণের রূপক।

কিন্তু শ্রবণের পরে, দর্শনের পরে চাই যে স্পর্শন ; অনুরাগের এখন মিলন, এখন যে

প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

তাই ত ভাস্কর্য্যের স্থাপত্যের উদ্ভব। গতির সুর আছে, গতির ধারা আছে, গতির আবার আছে একটা বস্তুসত্তা। কারণ, গতি এক হিসাবে কতকগুলি দ্রব্যের, ভৌতিক পদার্থের—স্থূল অণুপরমাণুর—অর্থাৎ যাহা স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাদের একটা সাজানর সমাবেশের ধরণ, তাহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ। স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্য সত্যসুন্দরের গতিলাঞ্ছনাকে এই ভৌতিক পদার্থগত সম্বন্ধের, আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ের সহায়ে প্রকটিত করিতেছে, ধরিয়া দিতেছে। সত্যসুন্দরের আছে অসীম অরূপ ভাব, তারপর আছে সসীম ব্যঞ্জনাপূর্ণ রূপ। এই রূপের আবার প্রথম বিকাশ চোখের দেখায়—রেখায়-রেখায় ও রঙে ; চিত্রবিদ্যা উঠিয়াছে এই স্তর হইতে। রূপ আরও স্পষ্ট, আরও স্থির নিবিড় হইয়া উঠে স্পর্শে, মাংসপেশীর চালনায়—যখন হাতে নাড়িয়া-চাড়িয়া একটা বস্তুর বিগ্রহেরই পরিচয় আমাদের হয় ; এই স্পর্শ, পেশীচালনা, হাতে নাড়া-চাড়া, এই বস্তুপরিচয় জন্ম দিয়াছে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যবিদ্যাকে। সকল শিল্পের মূলে আছে যে গতিবেগ তাহাকে ধরিয়া জমাট করিয়া স্থায়ী স্থাণু—বস্তু করিয়া রাখিতে চাহিতেছে সেই শিল্প।

কিন্তু স্পর্শেও মানুষের শেষ তৃপ্তি নয়, মানুষ চায় আবার মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে

সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে—

এই 'বাখান' ব্যতীত ভিতরের উপলব্ধিটি বাহিরে সম্পূর্ণরূপে, একেবারে শেষ করিয়া যেন ঢালা হয় না ; বাক্য ছাড়া অন্তরের অনুভব যেন সবখানি ব্যক্ত, পরিস্ফুট হয় না। তাই কাব্যের উদ্ভব। মিলনের পর সম্ভোগের আনন্দকে পরিপূর্ণ করিয়াছে এই কথা বলা। কবির প্রাণ

তাই 'কথা কও' 'কথা কও' বলিয়া আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তাই

কি আর কহিব আমি

বলিয়াও, কবি তাঁহার বলা শেষ করিতে পারিতেছেন না, ফিরিয়া আবার বলিতেছেন।

সত্যসুন্দরের যে গতিচ্ছন্দ দিব্যকর্ণে তাহা শুনিয়া শিল্পী গানের সৃষ্টি করেন, সত্যসুন্দরে যে ভঙ্গিমা তাহা দিব্যচক্ষে দেখেন আর ছবি আঁকিয়া তুলেন, সত্যসুন্দরের সত্যকে গতির আধারকে অন্তরাত্মার স্পর্শ দিয়া আলিঙ্গন করেন আর মূর্ত্তি গড়িয়া তুলেন। আর সত্যসুন্দরের সাথে অন্তরাত্মার বাণী দিয়া আলাপন করেন, আর কাব্যসৃষ্টি করিতে থাকেন।

এই আলাপন, কথা বলা মানুষের যতখানি সোজাসুজি অতি-আপনারই জিনিষ ততখানি আর কিছুই নয়। ভাষার মধ্যে মানুষের মানুষত্ব যেমন স্পষ্ট ধরা দিয়াছে, আর কোন জিনিষে তেমন ধরা দেয় নাই। মানুষ মানুষ—কারণ, তাহার ধর্ম্ম মনন চিন্তন, তাহার বুদ্ধিবৃত্তি, তাহার মস্তিষ্ক-পরিচালনা। আর এইসব কথা বা ভাষার মধ্যেই আসিয়া জমা হইয়াছে, বাক্যরূপেই ইহারা গড়িয়া উঠিয়াছে। ভাবের অভিব্যক্তির আবরণই ভাষা, কে বলিয়াছিল? আমরা মনে করি, ভাষাই ত ভাবের ভাস্বর বিগ্রহ! শ্রবণ দর্শন স্পর্শন জিনিষের ভিতরকার পরিচয় দেয় যেন গৌণভাবে; অথবা জিনিষটি ঠিক ঠিক দিলেও, জিনিষের যে বার্ত্তা, যে 'প্রাণের কথা' তাহা পুরাপুরি দিতে বা প্রকাশ করিতে পারে না। অন্যান্য শিল্প হইতে কাব্যের পার্থক্য এই যে, কাব্যের মধ্যে যতখানি চিন্তার বুদ্ধিবৃত্তির খেলা (intellectual) আছে অন্যত্র তাহা নাই, তাই কাব্যের মানুষ যেমন আপনাকে খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করিতে পারে আর কোথাও তেমনটি পারে না। গান দিতেছে উক্ত অশরীরী তুরীয় ভাব, চিত্র ও ভাস্কর্য্য দিতেছে এই ভাবের সাথে সাথে একটা বাহ্য রূপ। কিন্তু ভাব ও রূপের মাঝখানে একটা জিনিষ আছে সেটি গান, চিত্র বা ভাস্কর্য্য দেয় নাই—এটি

দেওয়া তাহাদের ধর্ম্ম নয়। এই মাঝখানের জিনিষটি কি? আত্মা ও আত্মা-অধিষ্ঠিত দেহ এই দুই-এর মাঝে আছে কি? আছে অন্তঃকরণ, ভাবের ও রূপের মাঝে আছে অর্থ, চিন্তা—'বাখান'। আত্মা, ভাব হইতেছে যেন সূর্য্য; দেহ, রূপ হইতেছে যেন পৃথিবী; কিন্তু অন্তঃকরণ, মন, চিন্তা, অর্থ হইতেছে অন্তরীক্ষ। কবি পৃথিবী ও সূর্য্যকে মিলাইয়া ধরিয়াছেন; তাঁহার মধ্যে অন্তঃকরণটি সুপরিস্ফুট, ব্যাখ্যানের ভিতর দিয়া মনের চিন্তার সহায়ে তিনি ভাবকে রূপান্বিত, আত্মাকে শরীরী করিয়া তুলিয়াছেন। কবির উপকরণ বাক্য এই অন্তঃকরণের মনের চিন্তার বাহন। অন্যান্য শিল্পে অর্থগৌরব যদি থাকে তবে আছে মৌনভাবে, কাব্যেই তাহাকে সাক্ষাৎভাবে পাই।

ইদানীন্তন কালের ঝোঁক অন্যান্য শিল্প অপেক্ষা কাব্যেরই উপর যে বেশী দেখিতে পাই তাহাতে আমাদের কথাটিই প্রমাণিত হয়। কারণ আধুনিক যুগ অন্তঃকরণের ধর্ম্মে যেমন অনুপ্রাণিত, চিন্তাসমূহে যেমন আঢ্য, সে রকম আর কোন যুগে ছিল না।

প্রাচীনতর যুগে কাব্যসৃষ্টি যথেষ্টই হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সব শিল্পবিদ্যাই মানুষের ভিতর হইতে যুগপৎ বাহির হইয়াছে। কিন্তু তবুও তখন কাব্য অপেক্ষা অন্যান্য শিল্পেরই ছিল প্রাধান্য ও প্রসার। এক সময়ে ছিল গান। আমাদের বেদ কাব্যহিসাবে ততখানি লক্ষিত হইত না যতখানি হইত মন্ত্রের গানের হিসাবে। তাই শ্রীভগবান বলিতেছেন—বেদানাং সামবেদোঽস্মি; কারণ সামবেদ হইতেছে সামগান। তাই গীতার নাম গীতা। এই গানেরই জের বঙ্গসাহিত্যে আমরা টানিয়া আনিয়াছি পদাবলীগাথা পর্য্যন্ত। প্রাচীন গ্রীসে গানের রাজা অরফিউসের প্রতিভা গ্রীসের সকল শিল্পসৃষ্টির গোড়ায়। গান যে আদি মৌলিক শিল্প তাহাও এই সঙ্গে আমরা বুঝিতে পারি। আর এক এক সময়ে ছিল চিত্র ও ভাস্কর্য্যের প্রাধান্য ও প্রসার—যেমন ভারতে বৌদ্ধযুগ ও

মোগলযুগ, ইউরোপে মধ্যযুগ রেনাসেন্সের যুগ। আধুনিক কালে কিন্তু চিত্র ও ভাস্কর্য্যের সে রকম প্রভাব ত নাই, বরং এই দুইটি বিদ্যা লোপ পাইতে বসিয়াছিল। ইহার কারণ আমরা নির্দ্দেশ করি, বুদ্ধিবৃত্তির উপর আধুনিক প্রাণের আত্যন্তিক ঝোঁক। কিন্তু কি চিত্রে, কি সাহিত্যে ও ভাস্কর্য্যে এই বুদ্ধিবৃত্তির খেলার তেমন সুযোগ নাই, আধুনিক শিল্পীর মন এইসব কলায় তেমন তৃপ্তি পায় না। সঙ্গীতবিদ্যাও কাব্যের তুলনায় যেন পিছনে পড়িয়া গিয়াছে। ফলত কাব্য আধুনিক জগতকে যেন ছাপাইয়া ফেলিয়াছে। বুদ্ধিতে প্রাণ আধুনিক যুগসাহিত্যের সহিত যে মিল ও যে সহজ সম্বন্ধ একটা পাইয়াছে আর কোন শিল্পের সাথে তাহা পায় নাই। এই সাহিত্যের মূল্য কি, সে কথা আমরা উত্থাপন করিতেছি না; আমরা শুধু দেখাইতে চাহিতেছি সাহিত্যের প্রভাব কতখানি হইয়াছে।

শুধু তাহাই নয়, কাব্য যেন আর-আর শিল্পকে নিজের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়াছে। প্রত্যেক শিল্পের আপন আপন অভিব্যঞ্জনাটি ধরণধারণটি কাব্য আপনার মধ্যে প্রতিফলিত করিতে পারে, সে সামর্থ্য কাব্যের আছে। গান গাহিবার বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া কাব্য যখন সৃষ্টি হইয়াছে তখনই আমরা পাইয়াছি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শেলী রবীন্দ্রনাথ ভের্‌লেন মেটেরলিঙ্ক—সমস্ত গীতিকাব্য ইহার ফল। কাব্যের মধ্যে, কেবল কথার সহায়ে ছবি আঁকিয়া যাইতে পারা যায় কি রকমে তাহার শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত ফরাসী কবি থেওফিল গোতিয়ে (Theophile Gautier); কালিদাসকেও আমরা এই সঙ্গে স্মরণ করিতে পারি। সমস্ত রোমান্টিক সাহিত্যের গঠনে দেখিতে পাই গানের ও চিত্রেরই প্রভাব। আর ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের ভঙ্গিমা লইয়া সমস্ত ক্লাসিক সাহিত্যটি গড়িয়া উঠিয়াছে। ভর্জ্জিল বা মিলতনের, বা আমাদের মধুসূদনের কাব্য, কর্ণেইর নাটক যেন এক-একটি মর্ম্মরে প্রস্তুত অট্টালিকা। প্রতি সর্গ, প্রতি অঙ্ক, প্রতি ছত্র যেন এক-

একটি প্রস্তর মূর্ত্তি, এক-একখানি শিলাস্তম্ভ—এমন নিবিড় সংহত নিথর স্থাণু একটা ভঙ্গী তাহাদের অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্যের সাধারণ রচনাভঙ্গীর কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা যদি দেশরীতির দিক দিয়া বিচার করি, তবে দেখিতে পাই এক-একটি দেশের কাব্যসৃষ্টিতে এই রকম এক-একটি বিশেষ শিল্পের ছাপ রহিয়া গিয়াছে। সমগ্র সংস্কৃতসাহিত্যে মোটের উপর দেখিতে পাই, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের প্রভাব—সংস্কৃতে কিছু রচনা করিতে গেলে আপনা হইতেই সে কেমন পাথরের মূর্ত্তি হইয়া উঠিতে চায়। লাতিনসাহিত্য এ বিষয়ে সংস্কৃতসাহিত্যের অনুরূপ। ইতালী-সাহিত্যে শুনি গানের লীলায়িত মূর্চ্ছনা; গ্রীকসাহিত্যও অনেকখানি এই ধরণের—গ্রীকের শিল্পদেবীর নাম (Muse-Mousa) হইতেই আসিয়াছে সঙ্গীতের নাম (music)। আমাদের বাঙ্গলাসাহিত্যও এই গানেরই ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত। আর ছবির ধরণে কাব্য আঁকিয়া তোলার দৃষ্টান্ত আমি দেখাইতে চাই—ফরাসীর ভাষায়। সূক্ষ্ম সুষীম তরলিত রেখায় ভাবের প্রতি অঙ্গ ফলাইয়া ধরা, ব্যঞ্জনার আলো-ছায়ার রঙে রঙে বক্তব্যকে বিচিত্র করিয়া ধরা—একটা রূপকে চোখের সম্মুখে জ্বলন্ত সরাগ করিয়া ধরা ফরাসীসাহিত্যের জন্মগত অযত্নসিদ্ধ কৃতিত্ব।

কাব্যকে তাই আমরা সকল শিল্পের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাই। ব্রাহ্মণের মত কাব্যের প্রাণ হইতেছে জ্ঞান, ব্রাহ্মণেরই মত কাব্যের উদ্ভব সহস্রশীর্ষ পুরুষের মুখ হইতে—জ্ঞানের প্রেরণায় বাক্যকে আশ্রয় করিয়া কাব্য সত্যসুন্দরকে উপলব্ধি করিতেছে, প্রকটিত করিতেছে। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য অন্তরাত্মার একটা সংহত শক্তিবোধের সৃষ্টি, শিল্প-বিদ্যার মধ্যে উহারা তাই ক্ষত্রিয়, সহস্রশীর্ষ পুরুষের বাহুবলেই ভর করিয়া উহারা যেন গড়িয়া উঠিয়াছে। চিত্রবিদ্যাকে বলা যাইতে পারে শিল্পের বৈশ্য—বৈশ্যের ধর্ম্ম যে নৈপুণ্য, কৌশল, চমৎকার করিয়া সাজান, তাহাই যেন চিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে। আর সঙ্গীত হইতেছে শূদ্র—

সঙ্গীত সকল শিল্পের গোড়ায় পদমূলে প্রতিষ্ঠায়, উহার ধর্ম্ম আর-সকল শিল্পবিদ্যার সেবা করা, সকল শিল্পবিদ্যাকে ললিতকলার একটা মূল ভঙ্গিমা বা সুর দিয়া সে চলিয়াছে।

সঙ্গীত হইতেছে শূদ্র; সঙ্গীতের স্থান সকলের নীচে, কিন্তু অধম বলিয়া নয়—সে সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে বলিয়া। পাছে আমাদের কথা কেহ ভুল বুঝেন, তাই আমরা সঙ্গীতের প্রভাব সম্বন্ধে আরও দুই-একটি কথা বলিতে চাই। যখনই কোন শিল্পকলায় একটা নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখনই দেখিতে পাই, মূলে রহিয়াছে সেই শিল্পকলার সুরের পরিবর্ত্তন, একটা নূতন সুরের সৃষ্টি—সেই শিল্পকলার প্রতিষ্ঠায় আছে যে সঙ্গীতের ভাগ তাহার অভিনব রূপ ও ভঙ্গী। গানে যাহাকে সুর বলি, চিত্রে ভাস্কর্য্যে স্থাপত্যে তাহাই সঙ্গতি সম্মেলন সামঞ্জস্য, কাব্যে তাহাই ছন্দ। বাল্মীকি অনুষ্টুপ ছন্দ রচিয়া সংস্কৃতে আদিকবি আখ্যা পাইয়াছেন। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের সুর দিয়া বাঙ্গলার কাব্য-প্রাণের একটা নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যে রূপান্তর আনিয়াছেন, তাহা তাঁহার বস্তুদানের উপর ততখানি নির্ভর করে নাই, যতখানি করিয়াছে তিনি যে ভঙ্গী যে ছন্দ যে সুর দিয়াছেন তাহারই উপর। রোদিন বা মেস্ট্রোভিকের মূর্ত্তিরচনা, মিলেট ও হুইস্‌লার অথবা আমাদের অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন ভাস্কর্য্যে চিত্রে সঙ্গতি সম্মেলন সামঞ্জস্যের একটা নূতন ধরণ নূতন ভঙ্গী দিতেছে অর্থাৎ সুরটি বদলাইয়া দিতেছে, তাই তাহারা একটা যুগপরিবর্ত্তনের সূচনা করিয়াছে।

আর দেশে দেশে যে শিল্পকলার পরিকল্পনার পার্থক্য, তাহা মূলত প্রধানত গড়িয়া উঠিয়াছে এই মৌলিক সুরপরিকল্পনার পার্থক্যকে ধরিয়া। এক-এক দেশের প্রাণে তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে এক-এক রকম সুর; তাই রূপকরণের কথনের ধারা দেশে দেশে বিভিন্ন। গ্রীক বা হিব্রু যে

আমাদের কাছে কেবলই গ্রীক ও হিব্রু, তাহার কারণ ইহাও বটে যে গ্রীক বা হিব্রু ভাষার অক্ষর আমাদের ভাষার অক্ষরের মত নয়, উহাদের শব্দকোষ ভিন্ন, ব্যাকরণ ভিন্ন; কিন্তু আসল কারণ গ্রীকের হিব্রুর ছন্দ বা সুর ভিন্ন রকমের। অক্ষর-পরিচয় সহজ, শব্দকোষ বা ব্যাকরণ আয়ত্ত করাও খুব কঠিন নয়, কিন্তু যতক্ষণ কোন ভাষার ছন্দ, গতিভঙ্গী, সুর হৃদয়ঙ্গম না করিতেছি, ততক্ষণ সে ভাষার উপর আমার পূর্ণ অধিকার হয় নাই। পরন্তু, শব্দকোষ ব্যাকরণ এমন কি অক্ষর-পরিচয়ও যদি তেমন পাকা না হয়, কিন্তু ছন্দবোধ থাকে পূর্ণমাত্রায়, তবে সে ভাষার স্বরূপটি বা অন্তরাত্মাটিরই সহিত আমাদের পরিচয় হইয়া গিয়াছে। ইউরোপ যে প্রাচ্যের চিত্র, ভাস্কর্য্য বা স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে অপারগ, আর্চ্চার (Archer) সাহেবের মত শিক্ষিত ও পণ্ডিত ব্যক্তিও যে ভারতের শিল্পকলাকে অবলীলাক্রমে 'barbarous, barbarian, barbarism' আখ্যায় ভূষিত করিতে পারেন, তাহার কারণ এই যে, বিদেশী বিদেশীর সৃষ্টির উপকরণ গঠন সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিলেও সেই উপকরণের গঠনের ছন্দকে সুরকে সহসা ধরিতে পারেন না। বিদেশীয় কথার অর্থ বুঝিতে পারি, তাহার পরিচয় সব জানিতে পারি, তাহার মনকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তাহার প্রাণের সুর যদি আমার প্রাণে না বাজে তবে বিদেশীকে আমি চিনি নাই।

তাই দেখি সুরকে গানকে যখন ভুলিয়া যাওয়া হইয়াছে, তখন শিল্প হইয়া পড়িয়াছে কৃত্রিম জড়পদার্থ। এই সুরকে গানকে হারাইয়া যদি বস্তু লইয়াই সে থাকে, তবে আর্ট তাহার প্রাণও হারাইয়া শুধু দেহটিকে লইয়া থাকে। কাব্য তখন হয় বাক্যসংগ্রহ, চিত্র হয় রঙের ও রেখার সমষ্টি, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য হয় পাথরের পুঞ্জ। কাঠামোকে যদি সঞ্জীবিত করিতে হয় তবে প্রয়োজন তাহাতে সঙ্গীতের উদ্বোধন, তাহার মধ্যে

সঙ্গীতের প্রাণ বহাইয়া দেওয়া। ফলত উনবিংশ শতাব্দীর জড়বাদের জড়ত্বের পর আজ শিল্পজগতে যে নূতন সৃষ্টি দেখিতেছি তাহার সর্ব্বত্র গানেরই প্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাব্য চিত্র এমন কি ভাস্কর্য্য পর্য্যন্ত যেন গানকেই মূর্ত্তিমান করিতে চাহিতেছে। Mystic school, Impressionist school—আমাদের বাংলার ভাবাত্মক (আধ্যাত্মিক) চিত্রাঙ্কনরীতি গানেরই প্রভাবে ভরপুর। জীবন্ত শিল্পরচনার ইহাই শেষ কথা, ইহা শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি না হইতে পারে কিন্তু নূতন জীবনের, আর্টে প্রাণপ্রতিষ্ঠার এখানেই যে আরম্ভ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে।

নারায়ণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭

চলিত ভাষা ও সাধু ভাষা

বঙ্গভাষায় দুই প্রকার গঠনপদ্ধতির প্রচলন হইয়াছে—এক সাধু ভাষা, আর মৌখিক বা চলিত ভাষা। সাধু ভাষা অর্থে আমরা পণ্ডিতী ভাষার কথা বলিতেছি না। সংস্কৃতের শুধু অনুস্বর-বিসর্গ বর্জ্জন করিয়া যে ভাষা হয়, সে ভাষা কখন বাঙ্গালীর ভাষা হইবে না। কিন্তু পণ্ডিতী ভাষা ব্যতিরেকেও এক সাধু ভাষা আছে, বঙ্কিমচন্দ্রকে যাহার প্রবর্ত্তক বলিয়া আমরা ধরিতে পারি এবং যাহাই সাহিত্যের ভাষা বলিয়া এ-যাবৎ পরিচিত হইয়া আসিয়াছে। পুস্তকে এই ভাষাই আমরা সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকি; এবং বঙ্গদেশের যিনি যে বিভাগেরই অধিবাসী হউন না কেন, পরস্পরের কথোপকথনের ভাষা না বুঝিলেও, এই পুস্তকের ভাষা সকলেই বুঝিয়া থাকেন, এবং লিখিলে সাধারণত এই ভাষাতেই লিখিয়া থাকেন। কিন্তু সম্প্রতি এক চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে যে, মৌখিক ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করিতে হইবে। এখন এই যে দুইটি প্রকরণ বা ধারা, ইহাদের গুণাগুণ কি, বঙ্গসাহিত্যে ইহাদের স্থান কি ও কেমন।

নব্যতন্ত্রীগণ যে কারণে সাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহার করিতে চাহেন তাহা আমরা যেমন বুঝিয়াছি, ক্রমে ক্রমে নির্দ্দেশ করিতেছি। প্রথমত চলিত ভাষার সরলতা। বলা হয়—ভাষার উদ্দেশ্য ভাবকে প্রকাশ করা, অতএব যে ভাষা যত সহজ সরল স্বচ্ছ, তাহার মধ্য দিয়া ভাব ততই স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিবে। ভাবটাই আসল জিনিষ, ভাষা ভাবের বাহক অথবা অনুগত দাস মাত্র। ভাষার আড়ম্বরের, পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্য্যের, জটিল কারুকার্য্যের নীচে ভাব যদি তলাইয়া যায় তবে

ভাষার সার্থকতা কি? সাহিত্যে যে পোষাকী ভাষা আমরা দেখিতে পাই, তাহা ভাবের, অর্থের স্বকীয় মূর্ত্তিটি সর্ব্বদাই আচ্ছাদিত রাখে; সেখানে ভাবের, অর্থের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ পাই না, মাঝে যেন একটি যবনিকা রহিয়া গিয়াছে। তার পর, মৌখিক ভাষার মধ্য দিয়াই আমরা প্রতিনিয়ত অন্তরের সকল ভাব প্রকাশিত করিয়া থাকি—ক্রোধে, ক্ষোভে, প্রেমে, আদরে এই ভাষাই ত আমাদের মর্ম্ম হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িতেছে। মৌখিক ভাষা আর আমাদের অনুভূতির মধ্যে একটা সহজ সামঞ্জস্য, একটা সরল সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি হয় ভাবের খেলার চিত্রাঙ্কন, তবে চলিত ভাষাই তাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণ; কারণ উহার মধ্যেই ভাবের রং-বেরঙের ছায়া প্রতিফলিত। তদ্ব্যতীত যদি মনগড়া একটি ভাষার আশ্রয় লই, তবে ভাষার দ্যোতনাশক্তি আমরা হারাইব, তাহা এত প্রাণস্পর্শীও হইবে না। সাধু ভাষা কৃত্রিম, আমরা চাই প্রকৃতির স্বতঃস্ফুরিত ভাষা।

আর প্রকৃতির দান যে ভাষা, যাহা natural, তাহার মধ্যেই ত জীবন। দৈনন্দিন জীবনের ভাষা বলিয়াই চলিত ভাষা জীবনীশক্তিপূর্ণ। সদাসর্ব্বদা আমরা ভাবের যে ঘাত-প্রতিঘাত অনুভব করিতেছি, তাহার সজীব স্পর্শ মৌখিক ভাষাকে সঞ্জীবিত রাখিতেছে, ওজঃপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। যাহা নিসর্গজাত, যাহা প্রকৃতিদত্ত, তাহাই শক্তিপূর্ণ। ঘরে বসিয়া পাঁচজন পণ্ডিতে মিলিয়া যুক্তি-তর্ক করিয়া যাহাকে তৈয়ার করি তাহা ক্ষণভঙ্গুর, বিশ্ববস্তুর সহিত তাহার মিল নাই, তাহার মধ্যে প্রকৃতির অফুরন্ত প্রাণশক্তি থাকিতে পারে না। চলিত ভাষা সহজ, সরল, প্রাণস্পর্শী, দ্যোতনাপূর্ণ, জীবনীশক্তিপূর্ণ—তাই চলিত ভাষাকেই সাহিত্যের ভাষা করিয়া তোলা উচিত।

নব্য সম্প্রদায় আরও বলেন যে, এক সময় ছিল যখন ভাষা লইয়া খেলাই সাহিত্যের শেষ কথা—অন্তত প্রধান কথা ছিল। কিন্তু আজ

জগৎ এক নূতন সাহিত্যসৃষ্টির সন্ধিস্থলে। পূর্ব্বে সাহিত্য ছিল দুই-চারি জনের চিত্তবিনোদনের সামগ্রী, পণ্ডিত অথবা শিক্ষক সম্প্রদায়েরই একচেটিয়া জিনিষ। নূতন সাহিত্যকে এক সঙ্কীর্ণ কোটর হইতে বাহির করিয়া সমস্ত জগতের উপর ছড়াইয়া দিতে হইবে, সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। সমস্ত মানবজাতির অন্তরের যে কথা, সাহিত্য তাহারই ছবি মাত্র, সমস্ত মানবজাতির যে প্রাণ, তাহার উপরই সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা; তাই সমস্ত মানবজাতিরই সহিত যদি সে একটা সজীব সংযোগ রাখিতে চায়, তবে মানবজাতির যে সহজ ভাষা, সাহিত্যে তাহাতেই কথা কহিতে হইবে। তথাকথিত সাহিত্যিকের ভাষায় কথা বলিলে, জগৎ তাহা কিছু আপনার বলিয়া উপলব্ধি করিবে না, তাহা জগতের বস্তু হইয়া উঠিবে না। জগৎ আজ ভাষার বাহাদুরী চায় না, ভাব ও ভাষার মধ্যে কোন কারুকার্য্যময় আবরণ রাখিতে চায় না, সে চায় ভাষাটি যাহাতে সহজে বোধগম্য হয়, সরলভাবে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা হইয়া থাকে, কালিদাস মিলতন সাহিত্যজগতে যাঁহারা এক-একজন অবতার, কয়জন তাঁহাদের রচনা পাঠ করে, সত্যত কয়জনই বা তাহা উপভোগ করে? জগৎ আজ তাঁহাদিগকে দূর হইতেই নমস্কার করিতেছে—জগৎ চায় নিজের এক নূতন সাহিত্য, সর্ব্বজনবোধ্য ভাষায় সর্ব্বজন-উপভোগ্য সাহিত্য।

সর্ব্বাগ্রে আমরা নব্যতন্ত্রীগণের এই শেষ কথাটির বিচার করিব। সাহিত্যকে সর্ব্বজনভোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে, এ কথার অর্থ কি? প্রথমেই আমরা বলিতে চাই, আপামর সর্ব্বসাধারণের জন্য সাহিত্য নয়, সাহিত্যের উদ্দেশ্য কেবল সকলের মনস্তুষ্টি করা বা সকলের বোধগম্য হওয়া নয়। বর্ত্তমান যুগে সর্ব্বত্রই সাধারণের মহিমা কীর্ত্তন করি, সর্ব্বত্রই দেখিতে চাহি গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নাই, ইহা সহৃদয়তা পরিচায়ক। কিন্তু এইটুকু বুঝা উচিত যে, মূর্খ অশিক্ষিত

জনসঙ্ঘ লইয়া কোন democracy স্থাপন করিতে যাওয়া বালুরাশির উপর হর্ম্ম্য-নির্ম্মাণের চেষ্টা মাত্র। প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপন করিবার পূর্ব্বে সাধারণকে যে কতখানি শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন—শুধু বিদ্যার দিক দিয়া নয়, ধর্ম্ম নীতি রুচির দিক দিয়া সর্ব্বতোভাবে—এ কথাটি অনেকে তেমন তলাইয়া দেখেন না। Democracyর উচ্চ আদর্শ যে সহজেই mob rule বা vulgarismএ পরিণত হইতে পারে, তাহার জন্য সাবধান হওয়া উচিত। বাস্তবিক পক্ষে, জগতে যাহা কিছু মহৎ, স্থায়ী, সবই অ-সাধারণ। সাধারণকে অতিক্রম করিয়াছে বলিয়াই উহা মহৎ। সাহিত্য বল, আর্ট বল, দর্শন বিজ্ঞান যাহাই বল, সবই অতি-সাধারণ। সাধারণ চক্ষে যাহা দেখা যায় না, সহজে যাহা অনুভব হয় না, তাহাই এ সকলের বিষয়। সাধারণ যদি সাধারণই থাকে, তবে সে ইহাদের মহিমা কিছু হৃদয়ঙ্গম করিবে না। মহৎকে সর্ব্বসাধারণের গোচর বা বোধগম্য করাইতে যাইয়া তাহার মহত্ত্বই তুমি নষ্ট করিবে।

এ কথাটি বিশেষরূপে প্রযোজ্য কবিতার জগতে। সাধারণ সকলে বুঝিল বা না বুঝিল, তাহার সহিত কাব্যসৃষ্টির কোনই সম্বন্ধ নাই। কবি শুধু দেখিবেন নিজের অন্তর, নিজে তিনি বুঝিলেন কি না, তাঁহার মধ্যে যে কাব্য-পুরুষ তাহার প্রাণস্পর্শী হইল কি না। অপরের অনুভূতির সহিত মিলাইয়া দেখিবার তাঁহার কোনই প্রয়োজন নাই, তাহা উচিতও নয়। সর্ব্বসাধারণের ভাষায়, কৃষকের ভাষায় সাহিত্য গঠন করিতে হইবে, এ আন্দোলন একেবারে নূতন কিছু নয়। ইউরোপের রোমাণ্টিক আন্দোলনের ইহাই ছিল একটা প্রধান সূত্র। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এই শিক্ষাই দিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক ঘটিয়াছে কি? ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা সাধারণের চলিত ভাষায় রচিত হয় নাই। তাহাকে সহজ simple যদি বলিতে চাও বলিতে পার, কিন্তু তাহাকে কখনই মৌখিক ভাষা বলিতে পার না। রোমাণ্টিক-ধুরন্ধর ভিক্তর হিউগোর ভাষার

সহিত চলিত ভাষার কোন সম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া একটু কষ্টকরই। বস্তুত রোমাণ্টিক কবিগণ যে সূত্র দিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত অর্থ অন্য প্রকার। ক্লাসিকযুগের কবিতা সাধারণের অবোধ্য, তাহার ভাষা সাধারণের নহে, তাহা অসরল—এজন্য রোমাণ্টিকগণ তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন নাই। ক্লাসিকগণ কবিতার উৎস যাহা, সেই গভীর অনুভূতি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন ; তাঁহাদের কবিতা ছিল বুদ্ধির রচনা, কেবল কৌশল বা বাহাদুরী দেখান। মানুষের সহিত, জীবনের সহিত তাঁহাদের কবিতার জীবন্ত, জাগ্রত সংযোগ ছিল না। রোমাণ্টিকগণ কবিতাকে মানুষেরই জিনিষ করিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু ইহার অর্থ নয় যে, মানুষের আপামর সকলে তাহা বুঝিবে বা তাহার রস গ্রহণ করিবে। মানুষের মধ্যে আছে যে কবি-অনুভূতি, কবিতাকে তাহারই ছবিরূপে দেখাইতে হইবে—ইহাই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। আমরা যদি বলি কোন বস্তুকে মানুষের প্রাণের জিনিষ করিয়া তুলিতে হইবে, তাহার দ্বারা এরূপ বুঝা যায় না যে, সেই বস্তুটির এমন রূপ দিতে হইবে যে, দেখিবামাত্র বিশ্বের সকলেই তাহা চিনিয়া ফেলিবে, আপনার বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবে। কবিতা সকলের অন্তরের জিনিষ ; কিন্তু নিজের অন্তরকে চিনে কয়জন, বুঝে কয়জন, কয়জনই বা সত্যত নিজের অনুভূতিকে অনুভব করিতে পারে ? যিনি পারেন, তিনি পারেন বলিয়াই কবি। জনসাধারণের সে বৃত্তি নাই বলিয়াই তাহারা কবি নয়। প্রকৃত কবি যে কথাটি বলেন তাহা সকলেরই, বিশ্বমানবেরই অন্তরের বস্তু, তাহা তাহারা সজ্ঞানে বোধ করুক বা নাই করুক।

কবির, সাহিত্যিকের অনুভূতি জনসাধারণের অনুভূতির অনুরূপ নয় ; সেই অনুভূতিকে প্রকাশ করিবার ভাষাও তাই সর্ব্বসাধারণের ভাষার অনুরূপ নয়—উহা তাঁহার নিজস্ব জিনিষ। তাই দেখি সকল সাহিত্যে, সকল ভাষায় poetic manner, poetic vocabulary

বলিয়া একটি জিনিষ আছে। বস্তুত, ভাষায় প্রেরণাই হইতেছে, আপনার মধ্যে এইরূপ আর-একটি ভাষা, কবিতার ভাষা গড়িয়া তুলা। মৌখিক ভাষাটি, প্রাকৃত ভাষাটি অতিক্রম করিয়া যতদিন না একটি পৃথক সাহিত্যের ভাষা সৃষ্ট হইয়াছে, ততদিন সে ভাষা ভাষা বলিয়াই গণ্য হয় নাই। আরও দেখি, মৌখিক ভাষার সহিত যখন সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে, প্রাকৃত ভঙ্গিমাটির প্রভাব যখন সব লুপ্ত হইয়াছে, সাহিত্য তখনই পূর্ণ সমৃদ্ধ মহোত্তম হইয়া উঠিয়াছে। ইংরাজিতে যতদিন "মিল্‌তন, ফরাসীতে যতদিন কর্ণেইর আবির্ভাব হয় নাই, ততদিন ইংরাজি ও ফরাসী ভাষার পূর্ণ মাহাত্ম্য প্রকটিত হয় নাই।

কারণ, এইটুকু বুঝা আবশ্যক, প্রত্যেক শাস্ত্রেরই আপন আপন পরিভাষা আছে। দর্শনের এক পরিভাষা, বিজ্ঞানের এক পরিভাষা। তুমি যদি বীজগণিত বা জ্যোতিষশাস্ত্রের রস গ্রহণ করিতে চাও বা সে সম্বন্ধে কিছু লিখিতে চাও, তবে সর্ব্বাগ্রে তাহার পরিভাষা আয়ত্ত করিতে হইবে। এ আপত্তি করিলে চলিবে না যে, তুমি যে ভাষা নিত্য ব্যবহার কর, সকলেই যাহা বুঝিতে পারে, সেই ভাষাতেই এ-সব বিষয় লিখিত হওয়া উচিত। সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা। সাহিত্য একটি শাস্ত্র, সাহিত্যেরও এক পরিভাষা আছে। সাহিত্য যে উপায়ে, যে ভঙ্গীতে, যে কথা দ্বারা আপনার বক্তব্য প্রকাশ করে, তাহা তাহার আপনারই। সর্ব্বসাধারণে দৈনন্দিন জীবনে যে প্রকারে আপন ভাব প্রকাশ করে, সাহিত্য যদি সে পন্থা অনুসরণ না করে, তবে তাহার উপর দোষারোপ করিবার কিছুই নাই। কারণ দৈনন্দিন জীবনে যে ভাবে, যে উদ্দেশ্যে আমরা কথা ব্যবহার করি, সাহিত্য ঠিক সেই ভাবে, সেই উদ্দেশ্যে তাহার কথা ব্যবহার করে না।

প্রতিদিন আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি, তাহা মুখ্যত প্রয়োজনের ভাষা। সাহিত্য কোন প্রয়োজনের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত নহে—অবসরের

আনন্দসৃষ্টিই সাহিত্য। এই কথাটি ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। প্রতিদিনের ভাষা প্রধানত কর্ম্মসিদ্ধির ভাষা। পরকে বুঝাইবার জন্য যতটুকু যে ভাবে প্রয়োজন, সেই ভাবে ততটুকু মাত্র আমরা কথা বলি। যত সংক্ষেপে, যত অল্প শব্দোচ্চারণে মনের ভাব পরকে জানাইতে পারি, তাহার অতিরিক্ত কিছু শক্তিক্ষয় করিতে চাহি না; অধিকাংশ স্থলে আবার, ততখানি আমরা বুঝাইতে চাহি না, যতখানি চাই বোধ করাইতে, —কোনরূপে অনুভব করাইতে। আকারে ইঙ্গিতে, ভাবে ভঙ্গীতে, অনুভূতির নীরব প্রসারণে যখন কুলাইয়া উঠে না, তখনই ভাষার সাহায্য লই। এই ভাষা শুধু প্রকাশ করিয়াই সন্তুষ্ট, কিন্তু জিনিষকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা পায় না। ইংরাজিতে I do not know স্থলে don't know (অথবা আরও চলিত কথায় dunno), ফরাসীতে je ne sais pas স্থলে sais pas, বাঙ্গলায় 'জানি না' স্থলে 'জান্নে', কর্ম্মজীবনের পক্ষে যথেষ্ট হইলেও হইতে পারে, কিন্তু উচ্চাঙ্গ সাহিত্যে এ-সকল কথার প্রয়োগ কিছু সুষ্ঠু নহে। সাহিত্যে চাই পূর্ণ অখণ্ড অনুভূতির পূর্ণ অখণ্ড বাক্—অর্দ্ধ-অনুভূত ভাব, অর্দ্ধস্ফুট বাক্ সাহিত্যের অঙ্গহানি করে মাত্র। কারণ জিনিষকে সুন্দর করিয়া, মহৎ করিয়া, পূর্ণ করিয়া দেখা—সুন্দর করিয়া, মহৎ করিয়া, পূর্ণ করিয়া বলাতেই সাহিত্যের মর্য্যাদা। সরল, সহজ করিতে যাইয়া বস্তুকে যদি ছোট করিয়া ফেল, 'অল্পে'র মূর্ত্তি দাও, তবে সে সরলতা সাহিত্যের সরলতা নহে।

তারপর দৈনন্দিন জীবনের ভাষাকে সজীব বল। কিন্তু এ সজীবতার মধ্যে স্নায়ুমণ্ডলীর চঞ্চলতাই অধিক। দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই ব্যস্ততা, ত্রস্ততা—কি করিয়া যথাসম্ভব শীঘ্র লক্ষ্যস্থানে পৌছান যায়। ইহার ভাষাও তাই অস্থির, বিক্ষুব্ধ, যেন আছাড়িয়া বিছাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্তু চাঞ্চল্যই জীবনের একমাত্র লক্ষণ নয়। সাহিত্যের ভাষা গতি চায়, কিন্তু তাহা হইবে আত্মস্থ, স্থিরসত্ব, সংযত-প্রবাহ। অধিকন্তু জীবন

সাধারণত আমরা অতিবাহিত করি হেলায় ফেলায়, কর্ণধারহীন নৌকার মত চলি ভাসিয়া ভাসিয়া—লক্ষ্যহীন, কেন্দ্রহীন, মেরুদণ্ডহীন। এই প্রকার জীবনের ভাষাও দেখি তাই কেমন তরলিত, বাঁধনশূন্য, গ্রন্থিহীন। সাহিত্যের জগতে আছে কিন্তু চিন্তার স্থৈর্য্য, ভাবের সংহতি, অনুভূতির গভীরত্ব। সাহিত্যের ভাষাও হইবে তাই গভীর, গম্ভীর, দৃঢ়সম্বন্ধ, তাপসভাবপূর্ণ।

বস্তুত দৈনন্দিন জীবনে আমরা অতিমাত্র স্থূলপ্রকৃতির দাস। সে জীবনে ভাবও মুখ্য জিনিষ নয়, ভাষাও মুখ্য জিনিষ নয়। রোজকার জীবনে ভাবকে অনুভব করিবার, ভাষাকে চিনিবার কোন অবসর বা প্রেরণাই আমাদের নাই। ভাবের স্বরূপে কি আনন্দ, কি সৌন্দর্য্য, কি মহত্ত্ব থাকিতে পারে, তাহা আমরা বোধ করি না। সাহিত্যের জগতে তাহা বোধ করি বলিয়াই সাহিত্য সাহিত্য। Natural হওয়াই সাহিত্যের ধর্ম্ম নয়। সাহিত্যের লক্ষ্য আর্ট, শিল্পরচনা। স্থূল প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া, স্থূল প্রকৃতির অন্তরে যে সত্যটুকু তাহা সৌন্দর্য্যপূর্ণ, রসপূর্ণ, মহত্ত্বপূর্ণ করিয়া প্রকট করাই সাহিত্যের সব কথা। প্রাকৃতিক বস্তু বা ঘটনা সাহিত্যিক যেমন হুবহু নকল করিয়া যান না, প্রাকৃতিক ভাষাও তেমনি সর্ব্বস্ব করিয়া লন না। সাহিত্যের বস্তু প্রধানত ভিতরের অন্তরাত্মারই বস্তু, সাহিত্যের ভাষাও ভিতরের অন্তরাত্মারই ভাষা।

এই ভাষা প্রতিদিন আমরা ব্যবহার করি না বলিয়া উহা যে কৃত্রিম, এ কথা বলিতে পারি না। মানুষের মধ্যে যে কবি-অনুভূতি তাহা প্রকাশ করিবার জন্য কবিতার ভাষা সৃষ্ট হইয়াছে। এই ভাষা সে অনুভূতির সহজ নৈসর্গিক ফল। ভাবের যে গভীর প্রেরণা, তাহার বশে সাহিত্যের ভাষা গড়িয়া উঠিতেছে। বাহিরের কর্ম্মজীবনের সংঘর্ষে যেমন আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্ত্তার ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্তরের ভাব-জীবনের চিন্তাজীবনের সংঘর্ষে তেমনি কবিতার সাহিত্যের ভাষা ফুটিয়া

উঠিয়াছে। বস্তুত উভয় ভাষাই প্রকৃতির দান। প্রকৃতির সহিত উভয়েরই জীবন্ত সংযোগ। তবে প্রকৃতির যে বাহ্য বিক্ষোভ, যাহা সহজে বোধ হয় অনুভব হয়, তাহা প্রকাশ করে চলিত ভাষা ; প্রকৃতির যে অন্তরের খেলা, যাহার প্রতীতি সহজে হয় না, তাহা প্রকাশ করিতে চায় সাধু ভাষা।

ভাষাকে যথাসম্ভব সহজ সরল তরল করিতে হইবে, এই কথার অন্তরালে রহিয়াছে ভাব ও ভাষার মধ্যে একটা নৈসর্গিক বিরোধের অনুভূতি। ভাষাকে সরল করিলেই যেন ভাব প্রাঞ্জল পরিস্ফুট হইতে বাধ্য। কিন্তু ভাব বা অর্থ বুঝিবার পক্ষে ভাষা সর্ব্বদা অন্তরায় মাত্র নহে। ভাবটি যদি অপরিচিত হয়, চিন্তাটি যদি সম্পূর্ণ নূতন প্রকারের হয়, তবে ভাষার সরলতা সে ভাব, সে চিন্তা হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়ভূত হয় না। ভাষা সরল করিলেই যে সাহিত্য সরল হইবে, এমন বাধ্যবাধকতা কিছু নাই। তারপর একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন, সাহিত্যিকের নিকট ভাবটিই প্রধান জিনিষ; ভাষার যে বিশেষ মূল্য নাই, এমন নহে। ভাব ও ভাষার মধ্যে রহিয়াছে সমান ধর্ম্ম, উভয়েই উভয়ের মর্য্যাদায় মহান্। ভাবের যেমন সম্মান আছে, ভাষারও তেমনি আছে। ভাব ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হউক কিন্তু ভাষা সর্ব্বদাই উলঙ্গ নিরাভরণ নিতান্ত সাধারণ হইবে—ইহাতে ভাবেরও যে মর্য্যাদাহানি হয় না, তাহা নয়। ভাষার নিজের অঙ্গসৌষ্ঠব, অলঙ্কার প্রসাধনাদিরও প্রয়োজন আছে। সিসেরোর ভাষা কি কেবলই নিরর্থক বাক্‌জাল? আমরা ত মনে করি সিসেরোর ভাষা সিসেরোর ভাবেরই উপযুক্ত বাহন।

চলিত ভাষা সরল আর সাধু ভাষা অসরল—কিন্তু কাহার নিকট? জনসাধারণের নিকট চলিত ভাষা সরল, সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যিকের নিকট সেই ভাষাই অসরল। কারণ জনসাধারণ যে কথা যে ভাবে বলিতে চায়, কবি ঠিক সেই কথা সেই ভাবেই বলিতে চাহেন না। সাহিত্যে আমরা সারল্য চাই—সে সারল্য হইবে ঋজুতা। কৃষকের মুখে কৃষকের ভাষা খুবই

সাজে। কৃষকের কণ্ঠে কৃষকের গান—তাহার ছন্দ, তাহার সুর, তাহার বাক্য, এক প্রকার মাধুর্য্যমণ্ডিত। কিন্তু সাহিত্যিক যিনি, কবি যিনি, তাঁহার অনুভূতি সাধারণ কৃষকের মত নহে। তাই তিনি যখন কৃষকের ভাষা বলিতে যান, তখন আমাদের কর্ণপীড়া উপস্থিত হয়; মনে হয়, ম্যাথু আর্নল্ডের কথা, ইহা simplicity নহে, ইহা হইতেছে simplesse—সারল্য নহে, সারল্যের ভণ্ডামী। ভাষাকে সরল করিলেই সব কিছু হইল না; অন্তরে সর্ব্বাগ্রে সরল—ঋজু হইতে হইবে। অন্তর যদি সরল হয়, ভাষাও তোমার সরল হইবে; বলি না, তাহা সর্ব্বজনবোধ্য হইবে, কিন্তু উহাই হইবে তোমার আত্মার ভাষা, তোমার অন্তরের কবি-পুরুষের ভাষা।

* *
*

রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষায় রচিত কবিতা অপেক্ষা চলিত ভাষায় রচিত কবিতাকে উচ্চতর স্থান দিয়াছেন। এখানে এই কথাটির বিচার করিব। চলিত ভাষায় যে প্রকার কবিতা হয় তাহার স্বরূপ, তাহার প্রকৃতি কি? রবীন্দ্রনাথ চলিত ভাষার কবিতার উদাহরণস্বরূপ দিয়াছেন

আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে ফুট্‌বে গো ফুল ফুট্‌বে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হ'য়ে গোলাপ হ'য়ে উঠ্‌বে।

এবং ইহাকে সাধু ভাষায় পরিবর্ত্তিত করিয়া দেখাইয়াছেন এইরূপে

সকল কণ্টক সার্থক করিয়া কুসুমস্তবক ফুটিবে।
বেদনা যন্ত্রণা রক্তমূর্ত্তি ধরি গোলাপ হইয়া উঠিবে॥

এখন এই দুইটির মধ্যে প্রথমটি যে কবিত্ব হিসাবে অনেক শ্রেষ্ঠ তাহা উপলব্ধি করিতে কাহারও বিশেষ কষ্ট হইবে না। প্রথমটি সরল ঋজু ভাবে একটি কথা ব্যক্ত করিতেছে, তাহা সহজেই আমাদের হৃদয়ে গিয়া স্পর্শ

করে। শেষোক্তটির মধ্যে ভাষার আড়ম্বর, একটা কৃত্রিমতা ভাবকে চাপিয়া ধরিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এইরূপে চলিত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। উত্তরে আমরা বলিব, রচনাপদ্ধতি দুইটির উদাহরণ যে ভাবে দেওয়া হইয়াছে, তাহা ঠিক ন্যায়সঙ্গত নহে। কারণ সাধু ভাষার উদাহরণ চলিত ভাষার উদাহরণের অনুবাদ মাত্র। মূল ও অনুবাদ যে কোন দিন সমপর্য্যায়ে দাঁড়াইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। আমরাও সাধু ভাষায় রচিত কোন কবিতা-পংক্তি চলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেখাইতে পারি, চলিত ভাষা কি হাস্যোদ্দীপক। কিন্তু এইরূপে তুলনা করা হয় না, গালি দেওয়া হয় মাত্র। শুধু শব্দের পর শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া বসাইয়া গেলেই যে চলিত ভাষা সাধু ভাষা হইয়া উঠে তাহা নয়। চলিত ভাষার যে গঠনপ্রণালী, যে বাক্যবিন্যাসরীতি, যে চিত্রণপদ্ধতি, যে গতিভঙ্গী, সাধু ভাষার সে সকলই অন্য প্রকার। "সকল কণ্টক সার্থক করিয়া"—ইহাতে সাধু ভাষার ছায়াদেহ কোনরূপে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু সাধু ভাষার নিজের সজীব দেহটি এখানে নাই। যে প্রকার ভাব ভঙ্গিমার সহজাত প্রেরণায় লিখিয়াছি "আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে" তাহা ঠিক বজায় রাখিয়া, শুধু শব্দের পরিবর্ত্তন করিয়া রচিয়াছি সাধু ভাষাটি। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থা, অনুভূতির যে ধরণটি লইয়া চলিত ভাষা লিখিত হয়, তাহা কিছু লইয়া সাধু ভাষা লিখিত হয় না। সাধু ভাষা লিখিতে হইলে সাধু ভাষার প্রাণ দিয়া লিখিতে হইবে।

সাধু ভাষার প্রাণ কি, চলিত ভাষারই বা প্রাণ কি? কোন্ ভাবে প্রণোদিত হইলে আমাদের অন্তর হইতে চলিত ভাষা ফুটিয়া বাহির হয়? কোন্ ভাবই বা সাধু ভাষা লইয়া বিচ্ছুরিত? সাধু ভাষার উদাহরণ, যেমন মধুসূদনের

সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে—

অথবা রবীন্দ্রনাথেরই প্রথম বয়সের

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী—

এই সঙ্গে ধরা হউক চলিত ভাষার কবিতা, রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের

সাম্‌নে এরা চায় না যেতে
ফিরে ফিরে চায়
এদের সাথে পথে চলা
হ'ল আমার দায়।

অথবা সত্যেন্দ্রনাথের

পিছল্ পথের পথিক ওগো দীঘল্ পথের যাত্রী!
কোথায় যাবে কোথায় যাবে, সাম্‌নে মেঘের রাত্রি।

এখন পাঠকের প্রাণের উপর ইহারা কি প্রকার অনুভূতি রাখিয়া যায়? আমরা ত বোধ করি, প্রথম দুইটির মধ্যে এক গাম্ভীর্য্য, এক আত্মপ্রতিষ্ঠ ভারিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে—সমালোচক-শিরোমণি ম্যাথু আর্নল্ড যাহাকে বলিবেন high seriousness; শেষ দুইটির মধ্যে তাহার অভাব—এখানে কবি চঞ্চলচিত্ত, মুখর, বাচাল। অনুভূতির প্রথম ধাক্কাতেই কবি এখানে মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন, চিত্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে, অনুভূতিটি যাহাতে গভীরতর সত্তার মধ্যে, আপনার অন্তরে সর্ব্বতোভাবে মিশিয়া মিলিয়া যাইতে পারে, সে অবকাশ তিনি দেন নাই। একটা ব্যস্ততার তাড়নায় তিনি যেন স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছেন না। মৌখিক ভাষায় সহজ-অনুভূত ভাবের তরল, মুখর এক ছবি পাই—সমুদ্রবক্ষে ঢেউগুলি সূর্য্যকিরণে যেন চক্ চক্ করিয়া ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে, চক্ষু তাহাতে সহজেই আকৃষ্ট, অভিভূত হইয়া পড়ে। কিন্তু গভীর প্রদেশস্থ ঘন নীলাম্বুর যে নিথর সত্বপূর্ণ স্থৈর্য্য, তাহার কিছু পরিচয় পাই না। কারণ, পূর্ব্বেই যেমন আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি, আমাদের দৈনন্দিন জীবন প্রধানত স্থূল অনুভূতি, প্রাণকোষের সহজ বিক্ষোভ লইয়া; মৌখিক ভাষা

দৈনন্দিন জীবনের ভাষা বলিয়া এই স্থূল জীবনেরই অনুরূপ ছায়া। মৌখিক ভাষা প্রাণস্পর্শী, মনোহারী হইতে পারে। যখন বলি

সাম্‌নে এরা চায় না যেতে
ফিরে ফিরে চায়—

কথাটি তখন খুব আপনার বলিয়া বোধ হয়, যেন ঘরের কথা, অতি পরিচিত আদর-সোহাগের বস্তু। কিন্তু সহজ বোধের কাছে যাহার অতি-*মাত্র পরিচয়, মুখ্যত যাহা স্নায়ুমণ্ডলীর প্রতিক্রিয়া অথবা ভাবপ্রবণতার অধীর উৎক্ষেপ, যাহাকে বল আপনার জিনিষ, তাহাই কবিতার সব কথা নয়। শ্রেষ্ঠ কবিতা মানুষের অত্যন্ত আপনার, সমধিক মর্ম্মস্পর্শী—প্রাণের তন্ত্রীকে গভীরভাবে আন্দোলিত করিয়া তুলে। উহা একটি খুব পরিচিত ভাবকেই বোধ হয় প্রকাশ করে—কিন্তু সে পরিচয়ে দৈনন্দিন পরিচয়ের তারল্য, অধৈর্য্য নাই। স্থূল জীবনের কার্য্যাবলী, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের ভাবপ্রবণতা—এই-সকল নিত্যপরিচিত বৃত্তিগুলিকে কবি পরিলক্ষিত করেন, নিত্যপরিচিতের ঊর্দ্ধে এক গভীরতর অনুভূতি, আত্মার কবিদৃষ্টির মধ্য দিয়া। নিত্যপরিচিত হইলেও সে-সকলকে নিত্যপরিচিতের গঠন দিয়া সৃষ্টি করেন না। এইরূপ নিভাঁজ দৈনন্দিনের পরিচিতের কবিতা মধুর রমণীয় আনন্দদায়ক হইতে পারে, কিন্তু সে আনন্দে মাধুর্য্যের নেশা মত্ততাই বেশী, সেখানে নির্ম্মল আত্মস্থ রসঘনের সন্ধান পাই না। আনন্দ আনন্দ, কারণ তপঃশক্তি তাহাকে সংহত করিয়া রাখিয়াছে। সকল শ্রেষ্ঠ কবিতার কান্তগুণ, রম্যতা, রসলাস্যের অন্তরালে নিহিত রহিয়াছে একটা high seriousness, একটা সমাহিত গাম্ভীর্য্য, সাবিত্রীর সেই নিগূঢ় উগ্র তপঃ-তেজ। আনন্দের মনোরম বিক্ষোভের অন্তরালে লুকাইয়া রহিয়াছে তীব্র তাপসপ্রকৃতি। মৌখিক ভাষা কবিতার এই তপস্বী প্রাণকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। তাই দৈনন্দিন কথোপকথনের ভাষা দেখি যেন কেমন মেরুদণ্ডহীন; নিজের উপর জোর

করিয়া দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই, আশ্রয়চ্যুতা পেলবাঙ্গী লতিকাটির ন্যায় ধরণীপৃষ্ঠে লুটাইয়া চলিয়াছে। ভাষায় নমনীয়তা চাই, কিন্তু তাহার মধ্যে সর্ব্বদা থাকিবে স্বপ্রতিষ্ঠ সামর্থ্য। ভাষা হইবে যেন সোণার তার, সেই প্রকার নমনীয় অথচ সেই প্রকারই কঠিন, ভারসহ। এলায়িত বিহ্বলতা ভাষার একমাত্র গুণ নহে।

আমাদের বক্তব্যটি আরও স্পষ্ট হইবে যদি লই সঙ্গীতের উদাহরণ। সঙ্গীতের জন্য কবিতা রচনা করিতে গেলে সচরাচর আমরা মৌখিক ভাষার প্রতিই আকৃষ্ট হইয়া থাকি। সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত গানগুলি প্রায়ই মৌখিক ভাষায় রচিত। ইহার কারণ সঙ্গীতের মধ্যে সাধারণে চাহে ভাববিহ্বলতা, স্নায়বিক উত্তেজনা—কঠোর শ্রান্তকর সব-কিছু হইতে মধুর বিশ্রাম, সহজ চিত্তবিনোদন, অথবা শান্ত আত্মস্থ ধ্যান-পরতার পরিবর্ত্তে অধীর আবেগ, বিক্ষুব্ধ চিত্তের খেলা। কাব্য অপেক্ষা সঙ্গীতকে আমরা অনায়াসে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছি; তাহার কারণ ধ্বনিই সঙ্গীতের সবখানি, আর ধ্বনির নৈসর্গিক ধর্ম্ম হইতেছে স্নায়ুমণ্ডলীকে উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গায়িত করিয়া তোলা। তাই যে সঙ্গীত চায় সহজ-অনুভূতিগ্রাহ্য, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়স্পর্শকারী তরল মাধুর্য্য, তাহা স্বভাবতই মৌখিক ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে, মৌখিক ভাষার সাহায্যেই তাহা আপনাকে বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত করে। কিন্তু যখনই সঙ্গীতে ভাববিলাসের নেশা, স্নায়বিক মত্ততার পরিবর্ত্তে চাহিয়াছি চিন্তার স্থৈর্য্য, ভাবুকতার গাম্ভীর্য্য, ধ্যানের আত্মরতি, তখন মৌখিক ভাষার সুলভ রসায়ন আমাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলিতেছেন

চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী—

তখন তাঁহার চিত্ত এক মাদকতার ঘোরে সংক্ষুব্ধ; কিন্তু যখন তিনি স্থির

ধীর আত্মসত্ত হইতে চাহিতেছেন, তখন ভঙ্গিমাটি পরিবর্ত্তন করিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছেন

অয়ি ভুবনমনোমোহিনি।

সংস্কৃত নাটকে আমরা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার দেখিয়া থাকি। রাজা কথা কহেন সাধু ভাষায়, বিদূষক কিন্তু কহেন চলিত ভাষায়। এই যে পদ্ধতি, ইহা কি অকারণে অথবা শুধু খেয়াল অনুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে? বিদূষক যে মূর্খ অশিক্ষিত প্রাকৃতজন মাত্র, তাহা নয়। রাজা অপেক্ষা বিদূষকই প্রায়শ অধিকতর জ্ঞানী, বুদ্ধিমান। তিনি যে সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ, তাহাও নয়, তবুও মৌখিক ভাষাতেই তাঁহার প্রতিভা প্রস্ফুটিত। আমাদের মনে হয়, বিদূষক যে ধাতুতে গঠিত তাঁহার যে প্রকৃতি, রাজার সে ধাতু সে প্রকৃতি নহে। উভয়ে জগৎটিকে দেখেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন চক্ষে। বিদূষকের প্রকৃতিতে মিশিয়া রহিয়াছে Burnsএর সেই

Whistle owre the lave o't—

জগৎটিকে তিনি চাহেন রহস্য করিয়া উড়াইয়া দিতে। কবি যেখানে ভাবকে গম্ভীর উদাত্ত ভঙ্গিমায়, প্রশান্ত পরিপূর্ণ ব্যঞ্জনায় প্রকটিত করিতে চাহিয়াছেন, মৌখিক ভাষার তরলিকা-তন্ত্রী সেখানে কার্য্যোপযোগী হয় নাই। নারীর চরিত্র গম্ভীর তপঃপ্রভাবপূর্ণ হইলেও সংস্কৃত নাটককার তাহার মুখে প্রাকৃত ভাষা দিয়াছেন, এ কথারও নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। নারী হইতেছে প্রকৃতি। আর প্রকৃতির ধর্ম্ম গতি, চঞ্চলতা, মুখরতা। নারী মূলত তাই ভাবপ্রবণ, অধীর, আত্মবিস্মৃত, বহির্দৃষ্টিযুক্ত। পুরুষের ধৈর্য্য, ধ্যানপ্রিয়তা, আত্মরতি নারীতে নাই। শুধু চিত্তরঞ্জক, শুধু মনোহারী, শুধু প্রেয় যে 'বিলোল হিল্লোলতা' নারীর আত্মধর্ম্ম তাহার প্রতি ইঙ্গিত করিবার জন্যই বোধ হয় সংস্কৃত কবি নারীর মুখে প্রাকৃত ভাষা দিয়াছেন। তাই শকুন্তলার কথায় গদ্‌গদ ভাবের অর্দ্ধস্ফুট ভাষার তরলিত মাধুর্য্য

তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণো দিবাবি রত্তিংপি
ণিক্কিব দাবই বলিঅং—

পুরুষের মধ্যে চাহি কিন্তু ভাবের নিথর প্রস্তরমূর্ত্তি, তাই দুষ্মন্তের মুখে শুনি আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবের পূর্ণ নির্ঘোষ

তপতি তনুগাত্রি মদনস্ত্বামনিশং মাং পুনর্দহত্যেব।

চলিত ভাষায় সুন্দর মনোহারী চিত্তাকর্ষক কাব্য রচনা হইতে পারে; কিন্তু উহার মধ্যে যে একটা তারল্য, অতিমাত্র সহজ রসোদ্গার সর্ব্বদাই মিশিয়া থাকে, তাহা লইয়া রামায়ণ, মহাভারত বা মেঘদূত রচনা করা দুরূহ। রবীন্দ্রনাথের

আমার সকল কাঁটা ধন্য ক'রে

অথবা সত্যেন্দ্রনাথের

পিছল পথের পথিক ওগো

অতি মনোভিরাম হইলেও, ইহাদের মধ্যে মধুসূদনের

সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি

বাক্যটিতে যে মহত্ব, সামর্থ্য ও ওজঃগুণ আছে তাহার কিছু নাই—উহাদের মধ্যে বরং শুনিতে পাই প্রতিধ্বনিত হইতেছে যেন Burnsএরই সেই

Whistle owre the lave o't.

জনসাধারণের কবি Burns উচ্চদরের কবি হইলেও, আদর্শ কবি নহেন। তাঁহার কাব্যে মনোহারিত্ব যতখানি পাই, মহত্ব ততখানি পাই না; ভাবের উচ্ছ্বাস যতখানি পাই, যোগসমাধির নিস্পন্দতা ততখানি পাই না।

ইংরাজি সাহিত্যে Ballad হইতেছে সাধারণ্যের, প্রাকৃতজনের, ঘরের কবিতা। কিন্তু Balladএর যে ভঙ্গিমা, যে ছন্দ তাহাতে ইংরাজি কাব্যের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তিটি ধরা দেয় নাই। কারণ, ম্যাথু আরনল্ড যেমন নির্দ্দেশ করিয়াছেন, Balladএর ভঙ্গিমায় পাই বাচালতা (garrulousness), ইহার ছন্দে পাই সফরী-গতি (jog-trot)।

কিন্তু আদর্শ যে কবিতা, তাহা বাগ্‌-বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হইলেও কখন বাচাল হইবে না, উহার ছন্দে গতির বেগ থাকা প্রয়োজন হইলেও তাহাতে কেবল অধীর প্লুতগতি থাকিবে না।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

"বাঙ্গলা ভাষায় আউল ও বাউলের গানে, মেয়েদের ছড়ায়, ঝরণার জলে নুড়ির মতো হসন্ত শব্দগুলো পরস্পরের উপর পড়িয়া ঠুন্ ঠুন্ শব্দ করিতেছে। ভদ্রসাহিত্যপল্লীর গম্ভীর দীর্ঘিকার স্থির জলে সে হসন্তের ঝঙ্কার নাই। আর সেইজন্যই সাধুভাষার ছন্দটা যেন মোটা ফাঁকওয়ালা জালের মতো, আর অসাধুটির একেবারে ঠাসাবুনানি।"

উত্তরে আমরা প্রথম জিজ্ঞাসা করিতে চাই, আউল ও বাউলের ভঙ্গিমায় সুন্দর মনোহারী কবিতা সৃষ্ট হইলেও হইতে পারে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ, আদর্শ কবিতা—great poetry—কিছু হয় কি? তারপর ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্ঘাতধ্বনিই কি ছন্দের সবখানি? আমরা ত মনে করি, ব্যঞ্জনবর্ণের ছেদহীন অবিরাম 'ঠুন্ ঠুন্' শব্দ, আমরা যাহাকে বলিয়াছি সফরীগতি, তাহা কর্ণের পক্ষে কিছু পরিশ্রান্তকর। আর মুখ্যত ইহা স্থুল শ্রবণকেই অভিভূত করে, অন্তরের মধ্যে যাইয়া পৌছিবার অবকাশ পায় না। সঙ্গীতে 'ঠুন্ ঠুন্' যেমন প্রয়োজন, ফাঁকের অবকাশেরও তেমনি প্রয়োজন, মূর্চ্ছনাটিকে থিতাইয়া জমাইয়া তুলিবার জন্য। হসন্ত বর্ণ একটির পর আর-একটি পড়িয়া এমন কোলাহল তুলিয়া দেয়, তাহাতে ভাবের দিকে, অর্থের দিকে আমরা মনোযোগ দিতে পারি না—উপলবাহিনী স্রোতস্বিনীর খরস্রোতে প্রতি উপলখণ্ডে প্রতিহত হইতে হইতে অসহায় মত্ত ভাবে যেন আমরা ছুটিয়া চলি। স্বরবর্ণ কিন্তু আমাদিগকে একটা অবকাশ, বিশ্রামস্থান দেয়; ধ্বনি সেখানে ভরিয়া জমিয়া উঠে, ভাব আত্মপ্রতিষ্ঠায় ভরপুর হয়, অর্থ ভাসিয়া ফুটিয়া উঠে। ব্যঞ্জনবর্ণের সংঘর্ষ যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

কোণভাঙ্গা তরঙ্গের উত্থানপতন—সে শব্দ তীব্র, তীক্ষ্ণ, অতিমাত্র প্লুত। স্বরবর্ণের সংমিশ্রণেই উহা মোলায়েম সুবলয়িত, একটি বিস্তৃতির মধ্যে উদার উদাত্ত হইয়া উঠে। সাধারণ ইউরোপীয় সঙ্গীত আমাদের নিকট যেমন বোধ হয় অধীর, ক্ষিপ্রগতি, বিরামহীন উত্থান-পতন, বাঙ্গলায় শ্রেণীবদ্ধ হসন্তবর্ণের গতিও ঠিক তেমনি বোধ হয়। ইহাতে স্নায়ুর প্রাণকোষের একটা সহজ-অনুভূত অতিশয় বাহ্যিক ধাক্কা পাই, কিন্তু শান্ত ধীর ক্রমপ্রসরণশীল ভারতের আধ্যাত্মিক সঙ্গীতের ভঙ্গী পাই না। রবীন্দ্রনাথের

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী
হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী—

ইহার ছন্দে আছে টানা ধীর গতি। হসন্তবর্ণের সে সংঘর্ষ, সে সংঘাত নাই; আর সেইজন্যই এক গাম্ভীর্য্যে, নিরেট সত্তায় ইহা ভরপুর। ইহাতে হসন্তবর্ণের সে অধীর ক্ষিপ্র প্লুত গতি নাই, তবুও ইহার নিজস্ব এক ক্ষিপ্রতা আছে—সে ক্ষিপ্রতা চলিয়াছে ধীর আত্মস্থিতিকে বেড়িয়া। আমরা জানি না 'উর্ব্বশী'তে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবটি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মহত্ত্ব তিনি পল্লীসঙ্গীতের ভঙ্গী ও ছন্দে কিছু প্রকাশ করিতে পারিতেন কি না।

স্বরবর্ণের খেলা গ্রীকভাষায় এক অপূর্ব্ব জিনিষ। শুধু স্বরবর্ণের আশ্রয়ে ধ্বনি কেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া লতাইয়া লতাইয়া উঠিয়াছে—কতখানি প্রসারের মধ্যে ধ্বনি তাহার প্রতিষ্ঠান পাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যাহাকে ফাঁকা বলিবেন, তাহার মধ্যে কতখানি শব্দ অর্থ ভাব ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। অবশ্য আমরা এমন বলি না যে, বঙ্গভাষার প্রকৃতি গ্রীকভাষার অনুরূপ। আমরা শুধু নির্দ্দেশ করিতে চাই, হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের 'ঠাসাবুনানি' ছন্দের সব কথা নয়। কেবলমাত্র স্বরবর্ণের লীলা, বাঙ্গলায় বোধ হয় ছন্দের গতির কিছু শিথিলতা উৎপাদন করে। তবুও স্বর ও ব্যঞ্জন

বর্ণের সম্মিলনে, উভয়েরই যথাযথ ব্যবহারে, ধ্বনি যে বৈচিত্র্য ও গাম্ভীর্য্যেই পূর্ণ হইয়া উঠে, তাহা অসত্য নয়।

এখন আমরা চলিত ভাষা ও সাধু ভাষার শব্দকোষ সম্বন্ধে কিছু বলিব। সাহিত্যে কিরূপ শব্দ প্রয়োগ করা উচিত? একই ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত যদি দুইটি শব্দ থাকে—একটি মৌখিক ভাষার আর-একটি সাধু ভাষার, তবে কোন্‌টি ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত? এ প্রশ্নেরও মীমাংসা নির্ভর করে, আমরা কি রূপে, কি ভঙ্গীতে ভাবটি প্রকাশ করিতে চাই। আমাদের উদ্দেশ্য যদি হয় শুধু ভাবটি ব্যক্ত করা, যত সহজ সরল উপায়ে, যত অধিক সংখ্যক লোকের বুদ্ধিগ্রাহ্য করা, তবে অবশ্য মৌখিক ভাষার শব্দটিই প্রশস্ত। কিন্তু সাহিত্যের একটি উদ্দেশ্য —প্রকৃতপক্ষে ইহার প্রধান উদ্দেশ্য—ভাবকে শুধু প্রকাশ করা নয় কিন্তু সুন্দর ভাবে, কেবল সুন্দর ভাবেও নয়, মহীয়ান ভাবে ফুটাইয়া তুলা। শব্দেরও নিজস্ব গুণ আছে। দুইটি শব্দ একার্থবাচক হইলেও উহাদের ধ্বনির পার্থক্য, অনুরঞ্জন-ক্ষমতার পার্থক্য রহিয়াছে। সাহিত্যের শব্দ চয়ন করিতে হইবে ধ্বনির মাধুর্য্য, উদাত্তগুণ দেখিয়া; উহার চারিদিকে যে ভাবরাশি সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে তাহার মর্য্যাদা বুঝিয়া। শুধু প্রাঞ্জলতা সরলতা নহে, দেখিতে হইবে আবার মহত্ত্ব গুরুত্ব। আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি, চলিত ভাষা প্রয়োজন-অতিরিক্ত কিছু চাহে না, যথাযথ মাত্রানুযায়ী হইলেই সে সন্তুষ্ট; কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে চাই একটা আনন্দের ঐশ্বর্য্য, বাস্তবের অল্পতা নহে, কিন্তু অতি-বাস্তবের বিপুলতা। মধুসূদন যখন ব্যবহার করিয়াছেন 'দম্ভোলি-নিনাদ', কথাটি পণ্ডিতী-ধরণের হইলেও হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে ভাব, যে গুণ ব্যক্ত করিতে চাহেন, তাহা ঐ কথাটিতেই পরিস্ফুট হইয়াছে। এমন কথা আমরা বলি না, চলিত ভাষার সব কথাই কিছু মহত্ত্বহীন। দৈনন্দিন জীবন অন্তরের শিল্পীজীবন হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত নয়—বহির্জগতের উপরেই

অন্তর্জগতের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু চলিত ভাষার প্রাণ অন্তর্জগতের মহত্ত্বের মধ্যে নয়। আর সাহিত্যের মুখ্য প্রযাসই হইতেছে ভাবের মহত্ত্ব অনুযায়ী মহৎ ভাষা সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে কবি চলিত ভাষা হইতে, অপ্রচলিত মাতৃকভাষা হইতে, নিজের কল্পনাশক্তি হইতে শব্দচয়ন শব্দরচনা করিয়াই সাহিত্যের ভাষা অথবা সাধু ভাষা সৃষ্টি করিতেছেন। ইহার মধ্যে কৃত্রিমতা কিছু নাই—অন্তরের একটা প্রেরণার জোরেই সে ভাষা গড়িয়া উঠিতেছে।

এমন হইতে পারে, বাঙ্গলায় এ সাধু ভাষা আজও তেমন সমৃদ্ধ, তেমন জাগ্রত হইয়া উঠে নাই। চলিত ভাষায় যত কথা যেমন সোজা-সুজি, যেমন তরতর ভাবে প্রকাশ করিতে পারি, সাধু ভাষায় সব সময়ে তাহা পারি না। কিন্তু চলিত ভাষার সে ভঙ্গী, ধীর গভীর মহত্ত্বব্যঞ্জক সাহিত্যের পক্ষে কতদূর শোভনীয়, তাহার পুনর্বিচার না করিয়া আমরা বলিতে চাই, সাধু ভাষা যদি তেমন দূরপ্রসারী, তেমন পরিস্ফুট, আমাদের কাছে তেমন স্পষ্ট ও আপনার না'ই হইয়া থাকে, তবে তাহা সাধু ভাষার দোষ নহে, দোষ আমাদের। আমাদের জীবন সাধারণত অন্তর্মুখীন নহে, ভাব-জগতে চিন্তা-জগতে আমরা নিত্য অধিষ্ঠিত নহি; অন্তরাত্মায় সে প্রেরণা অনুভব করি না, মহৎ ভাব, মহৎ চিন্তা মহৎ বাক্যের সাহায্যে প্রকটিত করা। আমাদের প্রকৃতি জড়তাভিভূত, কবি-অনুভূতি তন্দ্রালস—সহজলভ্য যে কথা, তাহার অতীত প্রদেশে যে মহাবাক্য, যে মন্ত্রটি রহিয়াছে, তাহা অন্বেষণ করিয়া বাহির করিবার কষ্টটুকু লইতে চাহি না।

মূল কথা হইতেছে এইখানে—ম্যাথু আরনল্ডের বাক্যে আবার আমরা বলি, simple ও natural হওয়াই সাহিত্যের একমাত্র গুণ নহে, সাহিত্য সর্ব্বোপরি চায় noble হইতে, grand হইতে; উহাতে চাই high seriousness. চলিত ভাষা সহজ সরল, উহা সুন্দর মনোহারী

হৃদয়স্পর্শী হইলেও হইতে পারে; কিন্তু উহার মধ্যে পাই না অচপল গাম্ভীর্য্য, নিথর সত্ত্ব—পাই না ধ্যানের, স্থিতপ্রজ্ঞার আত্মবিধৃত স্থৈর্য্য। সাহিত্যের ভাষার এই যে একটা গম্ভীর উদাত্ত গুণ, ইহার যে বিকৃতি হয় না, তাহা নয়। পণ্ডিতী ভাষাই হইতেছে এই বিকার। কারণ সে ভাষা শুধু বিদ্যার সম্ভার, শুধু বুদ্ধির অলঙ্কার। সাহিত্যের ভাষা সাধু ভাষা একদিকে যেমন বুদ্ধির নয়, অন্যদিকে তেমনি সাধারণের সুলভ অনুভূতির ভাষাও নয়। এই দুইটির প্রকৃষ্ট গুণ যাহা, তাহা লইয়া একটা গভীরতর অনুভূতির অভিজ্ঞার উপর সে ভাষার প্রতিষ্ঠা। একদিকে তাহা সহজ সরল হউক না হউক কিন্তু জীবনীশক্তিপূর্ণ; অন্যদিকে বৃথা আড়ম্বরগ্রস্ত না হইয়াও আবার মহান্, উদাত্ত, সত্ত্বপূর্ণ।

২

সাহিত্যকে ভাবে ও ভাষায় গম্ভীর, উদাত্ত, কেবল গুণিজনবোধ্য করিয়া তুলিবার যেমন একটি ব্যাধি আছে, ঠিক তেমনি তাহাকে সহজ, সরল, জনসাধারণের নিকটতর উপভোগ্য বস্তু করিয়া তুলিবারও একটি ব্যাধি আছে। এই যে দুইটি আদর্শ, তাহার কোন একটিকেই অতিমাত্র করিয়া দেখা ও অপরটিকে ঘৃণা বা তুচ্ছ করাই দূষণীয়। নতুবা সাহিত্যে উভয়েরই স্থান আছে, উভয়ের সম্মিলনেই সাহিত্যের পূর্ণতর অভিব্যক্তি। বাঙ্গলার সাহিত্যক্ষেত্রে আজ যে তথাকথিত চলিত ভাষা ও সাধু ভাষার মধ্যে মল্লযুদ্ধ চলিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রতিবিম্বিত এই দুই রকম প্রেরণারই খেলা। নবীন সাহিত্যিকগণের অনেকেই দেখিতেছি, শুধু 'বাংলাভাষা' আঁকড়িয়া ধরিয়াছেন; আমাদের প্রয়াস, তাই তাঁহাদিগকে বুঝান যে, 'বঙ্গভাষার'ও দাবি তাঁহাদের উপর আছে; বঙ্গভাষা বাঙ্গালীরই ভাষা।

বাঙ্গলার সাধু ভাষাটি কুলেখকের হস্তে প্রাণহীন, আড়ষ্ট, আড়ম্বরগ্রস্ত

পণ্ডিতী ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। চলিত ভাষা তাই চাহিতেছে—সে ভাষাটি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া সরল, প্রাঞ্জল, জীবন্ত করিয়া তুলিতে; টোলের শুষ্ক বাদবিতর্কের সঙ্কীর্ণ কোটরে, পাণ্ডিত্যের সাজসরঞ্জামের বন্ধনে যাহার প্রতিষ্ঠা তাহাকে টানিয়া বাহিরের আলোকে, বাতাসে, ধূলামাটীতে, জীবনের মুক্তপ্রাঙ্গণে ছাড়িয়া দিতে। চলিত ভাষা এই আদর্শটিকে যতখানি কার্য্যকরী করিয়া তুলিতেছে, ততখানিই তাহার সার্থকতা। কিন্তু তাই বলিয়া শুধু চলিত ভাষার ভঙ্গিমাটির মধ্যেই যদি আবার বাঙ্গলাভাষাকে পুরিয়া রাখিতে চাই, তবে তাহাকে সমৃদ্ধ না করিয়া পঙ্গু করিয়াই ফেলিব। কোনরূপ দক্ষতা যাহার নাই, তাহার হাতে সব ভাষারই দুরবস্থা—সে চলিত ভাষাই হউক আর সাধু ভাষাই হউক কিম্বা অন্য কোন প্রকার ভাষাই হউক। কিন্তু এইখানে একটি কথা উঠিয়াছে যে, চলিত ভাষা—চলিত ভাষার ভঙ্গিমাই হইতেছে বাঙ্গালীর আপনার ভাষা, বাঙ্গলার যথার্থ ভঙ্গিমা। কবিকঙ্কণ হইতে ঈশ্বর গুপ্ত অবধি দেখি এই ভাষারই খেলা; ইহাকেই ভিত্তি ধরিয়া তবে প্রতিভা যাহা কিছু গড়িয়া তুলিবে। বাঙ্গলাভাষা 'অল্পপ্রাণ অক্ষরবহুল', ইহাতে শব্দের অলঙ্কারের ওজঃশক্তির গুরুভার সহিবে না। অতিপ্রাচীন inflexional ভাষায় যাহা চলিত, বর্ত্তমান যুগের analytical ভাষায় তাহা চালাইবার চেষ্টা অতীতের প্রতি একটা নিরর্থক অন্ধভক্তির উদাহরণ মাত্র। বাঙ্গলাভাষা—বাঙ্গলার হাটে-বাটে আউলে-বাউলে ছড়ায়-কীর্ত্তনে যে ভাষা প্রচলিত—সাধুভাষাটি তাহার উপর এই পরধর্ম্ম চাপাইতে চাহিয়াছিল, তাই বঙ্গীয় সাহিত্যপ্রতিভা মুক্তভাবে ফুটিতে পারে নাই। বাঙ্গলাভাষার যদি এই শক্তি—এই গৌড়ীয় রীতি ধারণ করিবার সামর্থ্য না'ই থাকে, তবুও ক্ষুণ্ণ হইবার কিছু নাই, ইহাতে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নাই। সব ভাষাতেই সব গুণ থাকে না, থাকিবার প্রয়োজনও নাই। যে গুণ থাকে, তাহার মধ্য দিয়াই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হইতে পারে।

কিন্তু এই যে ভাষার একটি বিশেষ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা যে অকাট্য সনাতন, এ কথার প্রমাণ কি? সব ভাষারই একটা বিশেষ প্রকৃতি আছে, সত্য বটে; কিন্তু কয়েকটি বিশেষণের মধ্যেই কি তাহাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলা যায়, আর বিশেষত যখন সে ভাষা কেবল গড়িয়া উঠিতেছে, পূর্ণাঙ্গ পরিপুষ্ট হইতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র? চলিত ভাষা বলিয়া আমরা যে সুর বাঁধিয়া দিতেছি, তাহার মধ্যেই কি বাঙ্গলার সব ভবিষ্যৎ? আমরা ত মনে করি, এইরূপে বাঙ্গলার ভবিষ্যৎকে আমরা খর্ব্ব করিয়া আনিতেছি, তাহার কতকগুলি possibilitiesকে বহিষ্কার করিয়া দিতেছি। বস্তুত পণ্ডিতদিগের যতই দোষ থাকুক না কেন, তাঁহারা যে বাঙ্গলাভাষার একটা সম্পূর্ণ নূতন শক্তির উৎস খুলিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রকৃতিকে উদার ও মহৎ করিয়াই তুলিয়াছেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন বাঙ্গলার সাহিত্যে ও ভাষায় যুগান্তর আনিয়াছেন, আমরা সকলেই বলিয়া থাকি, কিন্তু এ কথার তাৎপর্য্য ঠিক ঠিক যে হৃদয়ঙ্গম করি, এমন বোধ হয় না। এই নবযুগের পূর্ব্বে বাঙ্গলা কি ছিল তাহার যথাযথ প্রতিকৃতি পাই চণ্ডীদাসে, আর কি হইতে পারে তারও চরম অভিব্যক্তি ঐ চণ্ডীদাস। তাহা হইতেছে বাঙ্গালীর 'গেরস্থালী'তার পরাকাষ্ঠা। তাহার ভাব তাহার ভাষা অতিমাত্র বাঙ্গালীর, বাঙ্গালীর প্রাণের যা বিশেষত্ব, যে নিছক স্বাতন্ত্র্যটুকু তাহারই পরিস্ফুরণ। কিন্তু সেই সঙ্গেই মিশিয়া রহিয়াছে কেমন একটা প্রাদেশিকতা, একটা সঙ্কীর্ণতা, একটা 'ঘরমুখো' প্রকৃতির ছায়া, বিশ্বজীবনের উদার বহুল তরঙ্গায়িত বৈচিত্র্যের সহিত একটা সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অভাব। তাহা সরল, প্রাঞ্জল, প্রাণস্পর্শী, মাধুরিমাময় সন্দেহ নাই, কিন্তু ছায়ার কোলে বর্দ্ধিতা লতিকার ন্যায় তাহাতে কেমন তেজের, সামর্থ্যের অভাব, যেন বিগলিতদেহা, প্রতিনিয়তই বসুধালিঙ্গনপরা।

কিন্তু ইংরাজের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙ্গালী যে দিন বাঙ্গলার প্রাণ ছাড়িয়া বিশ্বপ্রাণের বার্ত্তা পাইল, শুধু নিজের ঘরের যে অনুভূতি, যে অভিজ্ঞতা, তাহা ছাড়াইয়া যে দিন সমস্ত জগতের বিপুল বিচিত্র রসের সন্ধান পাইল, সে দিন তাহার সে পূর্ব্বতন চিরপরিচিত ভাষা ও ভঙ্গিমা এ নূতন জীবনের স্পন্দন আর ধারণ করিতে পারিল না। সে চাহিল নূতন আধার, জীবন-সঙ্গীতের নূতন মূর্চ্ছনার অনুরূপ তাহার ভাষার নূতন সুর নূতন ছন্দ। আর ইহারই ফল বিদ্যাসাগর, মধুসূদন। মুকুন্দরাম অথবা চণ্ডীদাসের পন্থা অনুসরণ করেন নাই বলিয়া বিদ্যাসাগর মধুসূদনকে যদি অ-বাঙ্গালী স্থির করি তবে আমরা বাঙ্গলা ভাষায় ও সাহিত্যে একটা সঙ্কীর্ণ আদর্শ ই খাড়া করিয়া তুলিব। হইতে পারে, এই প্রথম আচার্য্যগণ ভাষায় যে-সব নূতনত্ব আনিয়াছিলেন, তাহার সব টিঁকিবার নয়, টিঁকা উচিতও নয়। কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গলাভাষায় যে বজ্রসার, যে গুরুত্ব, যে একটা লাতিন-প্রতিভা অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গলার চির-সম্পদ, তাহা শুধু অতীতের এক ক্ষণিক বিকৃতি নহে ; পরন্তু মহোজ্জ্বল ভবিষ্যতেরই পূর্ব্বাভাস।

ইংরাজি ভাষাতেও চসার ছিলেন খাঁটি ইংরাজ—The well of English undefiled. তাঁহার ভঙ্গিমা ছিল ইংরাজের অতি আপনার গৃহস্থালীভাবেরই প্রতিমা। কিন্তু এলিজাবেথের যুগে ইংরাজ-জাতির দৃষ্টি যখন ইংলণ্ডের সীমাটি অতিক্রম করিল, আপন গণ্ডীটি ছাড়িয়া নূতন জ্ঞানে নূতন প্রেরণায় তাহার অন্তরাত্মা ভরপুর হইয়া উঠিল, তাহার কর্ম্মবীরগণ যখন অসীম সাগরের পারে ছুটিয়া চলিলেন, তখন সে জাতির সাহিত্য-ভাষাও ধরিল এক নূতন আকার। আদর্শ কর্ম্মবীর রোমকের ভাষা সে সহজেই আপনার করিয়া লইল। আর তারই ফল শেক্সপীয়র মিল্টন। তখনকার আলোড়ন-মিশ্রণের মধ্য দিয়াই উৎপন্ন হইয়াছে ইংরাজি ভাষার পূর্ণাঙ্গ দেহটি, পরবর্ত্তী যুগে কুইন

আনে'র সময়ে তাহাই সাধারণ সাহিত্যের ভাষা রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আর বর্ত্তমান যুগে সে ভাষার যতই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকুক না কেন, কাঠামোটি এখনও সেই একই রহিয়াছে। খাঁটি অবিমিশ্রিত ইংরাজির ধরণটি বজায় রাখিবার জন্য তখনও প্রচেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু ইংরাজের মুক্তপ্রতিভা কোনরূপ বন্ধন বা সঙ্কীর্ণ মানদণ্ডে আপনাকে আঁটিয়া রাখিতে পারে নাই। শুধু লাতিন কেন, বৈদেশিক সব ভাষা হইতেই ইংরাজ যেমন সহজে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে উপকরণরাজী সংগ্রহ করিয়াছে, বৈদেশিক ভঙ্গিমায় আপনাকে যথেচ্ছা ঢালিয়া দিয়াছে, এমন কোন জাতি তাহা পারে নাই। সাহিত্যে সব ভাষাই কেমন বর্ণসঙ্করের ভয় করিয়া আসিয়াছে, চাহিয়াছে নিজের রক্তের শুদ্ধতা বজায় রাখিতে; কিন্তু ইংরাজি ভাষা তেমনটি করে নাই। তাই দেখি, ইংরাজি ভাষা তাহার কবি শেক্সপীয়রের মতনই এত স্বাধীন এত বৈচিত্র্যে ভরা; ভাবরাজ্যে—আর সেইজন্য কর্ম্মরাজ্যেও এত দূরপ্রসারী। মানুষের কণ্ঠে যত রকম ভাবের, যত রকম ভঙ্গিমার খেলা ফুটিয়া উঠিতে পারে, ইংরাজিতে তাহার যতখানি প্রকাশ দেখিতে পাই, আর কোন ভাষায় ততখানি পাই না। সত্য বটে, বিশেষ ভাষার এক বিশেষ গুণ আছে এবং সেই গুণের দিক দিয়া দেখিলে ইংরাজি ভাষা অন্যান্য ভাষা হইতে নিকৃষ্টতর হইতে পারে। ফরাসী ভাষার প্রাঞ্জলতা, তাহার বলম্বিত গতিভঙ্গিমার তুলনা নাই। ইতালীয় ভাষার সে মধুর সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা আর কোন ভাষায় অসম্ভব। কিন্তু ইংরাজি যদি এইরূপ কোন বিশেষ আদর্শ, একটা বিশেষ standard খাড়া না করিয়া থাকে, তবে তাহাতে ক্ষতি না হইয়া বরং লাভই হইয়াছে; তাহার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে বিশ্বপ্রকৃতিরই বহু রূপ। স্বাতন্ত্র্যকে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে অবাধ গতি দেওয়ার ফলে তাহাতে বহুল ভঙ্গিমা, এত অশেষ সম্ভাবনীয়তা স্থান পাইয়াছে। সেইজন্যই দেখিতে পাই, বিদেশী ভাব ইংরাজিতে যেমন

যথাযথ ব্যক্ত হয়, আর কোন ভাষায় ঠিক তেমনটি হয় না। গ্রীক, লাতিন, সংস্কৃত অথবা আধুনিক কোন ভাষায় রচিত কাব্যের ইংরাজি অনুবাদ যত সহজে, নিখুঁত ভাবে, যত মূলানুযায়ী করিয়া তোলা যায়, অন্যান্য ভাষায় তাহা যায় না। ফরাসী ভাষায় শুধু ফরাসী প্রতিভার অনুরূপ সৃষ্টি ব্যতীত বিদেশী কিছু প্রতিফলিত করা নিতান্তই কঠিন—ইংরাজিতে যেখানে সাধারণ লেখকের দক্ষতাই যথেষ্ট, ফরাসীতে সেখানে দরকার হইবে একজন genius.

ফরাসী ভাষার টলটল প্রাঞ্জলতায় আমরা মুগ্ধ, এবং দেখাইয়া থাকি বাঙ্গলার প্রকৃতি কতখানি ফরাসীর অনুরূপ। আর সেইজন্য বাঙ্গলাকে কেবল ফরাসীরই আদর্শে গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছি। কিন্তু ফরাসী ও বাঙ্গলার মধ্যে যতই মিল থাকুক না কেন, বাঙ্গলার অন্তরে যদি কিছু নূতন সম্ভাবনা থাকে বা নূতন কিছু অনুস্যূত করিয়া দিতে পারি, তবে তাহাকে প্রথম হইতেই পরধর্ম্ম বলিয়া নিরসন করিবার যথেষ্ট কারণ দেখি না। সব ভাষায় সব রকম সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ভাষার কোন একটি পদ্ধতি বা ভঙ্গিমাকে একান্ত করিয়া ধরিতে হইবে, তাহার অতিরিক্ত কিছু করিবার প্রয়োজন নাই, এমন বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' বা 'ঘরে বাইরে' খুব সুন্দর—খুব মনোহারী হইতে পারে, বাঙ্গলা গদ্যের একটা নূতন দিক বোধ হয় খুলিয়া দিয়াছে, অথবা চণ্ডীদাসের সে পূর্ব্বতন বাংলারই সরলতা ঋজুতা সরস অন্তরঙ্গতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে; কিন্তু কেবল সেইটুকুই যে বাঙ্গলার প্রাণ, তাহার চরম বিকাশ, আর যাহা কিছু, তাহা আরোপমাত্র, তাহা সংস্কৃত-ইংরাজির জীবনশূন্য অনুবাদ, এরূপ নির্দ্দেশ করাও দুঃসাহসই।

বাংলা ভাষায় আমরা সংস্কৃতের একটা বিশিষ্ট স্থানই দিতে চাই, তাহার কাব্যে লাতিন-প্রতিভারও ছবি পাইতে চাই—ধ্বনির পূর্ণতা,

অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্যকেও বহিষ্করণ করিতে চাই না—সেইজন্য যে আমাদের লক্ষ্য বাঙ্গলাকে গৌড়ীয় রীতিতে গড়িয়া তুলা বা তাহার কাব্যে কেবল declamation ভরিয়া দেওয়া, সে আশঙ্কা কেহ করিবেন না। সাধু ভাষা যে সহজ সরল প্রাঞ্জল হয় না, তাহা নয়। আবার বর্ণে শব্দে আভরণে অলঙ্কারে সাজিলেই কাব্য যে declamation হইয়া পড়ে, তাহাও নয়। Great Poetry সন্ন্যাসীর মত একেবারে নিরাভরণ হইতে পারে, আবার সকল রকম সাজপোষাকে রাজমূর্ত্তিও ধরিতে পারে। দুই রকম সত্যের, দুই রকম ভাবের দুই রকম অভিব্যক্তি মাত্র। আমাদের মতে সাধু ভাষাটি এই উভয় ছাঁচেই ঢালা যাইতে পারে। চলিত ভাষা যদি একটিকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, তবে বলিব, সাহিত্যের আদর্শকে সে সঙ্কীর্ণ করিয়া দিতেছে, বাঙ্গলাকে ঘরের কোণে বাঁধিয়া রাখিতে চাহিতেছে।

সাহিত্যের ভাষার একটা standard স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে আর-একটি কথা বলা হয় যে, কলিকাতা-অঞ্চলের কথোপকথনের ভঙ্গিমা অনুসারেই বাঙ্গলাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে; কারণ, বাঙ্গলাভাষার স্বাভাবিক গতিই দেখিতেছি এই দিকে। আর সাহিত্যের ভাষাকে জীবন্ত রাখিতে হইলে এইরূপ একটা চলিত বা দৈনন্দিন মৌখিক আলাপনের ভাষারই অনুরূপ করিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু কোন দেশের একটা dialect-বিশেষই যে সে দেশের সর্ব্বসাধারণের সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিবে, এমন কোন অকাট্য নিয়ম কিছু নাই। দান্তে তস্কানের (Tuscan) প্রাদেশিক ভাষাকে ইতালীয় সাহিত্যের ভাষা করিয়া তুলিয়াছিলেন বটে কিন্তু সব দেশে এমন ঘটে নাই বা ঘটিতে বাধ্য নয়। ইংলণ্ডে সাহিত্যের ভাষা King's English কোন প্রাদেশিক ভাষার গড়নে গঠিত হয় নাই। দেশের নানা দিক হইতে ফরাসীপ্রভাবগ্রস্ত রাজপরিষদে যে নানান ভাষাভাষীর মিশ্রণ হইয়াছিল,

সেই আংগ্লোসাক্সনের নানা dialect ও নর্ম্মাণ ভাষার মধ্য হইতে উঠিয়াছে ইংরাজি। ফরাসীকে বলা হয় বটে Isle de Franceএর ভাষা, কিন্তু সে ভাষা কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; পরিবর্ত্তনের ফলে, অন্যান্য dialectএর কত মিশ্রণের ফলে, পণ্ডিতদিগের কত পাণ্ডিত্যেই (scholasticism) পরে তবে সাধারণের সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। প্যারীনগরে যে ধরণে কথোপকথন চলে, তাহার সহিত এখন এই সাহিত্যের ভাষার সাদৃশ্য খুব অল্পই। আর প্রাচীন গ্রীসে যখন সাহিত্যের একটা সর্ব্বসাধারণ ভাষা গড়িয়া উঠিল, তখন সেই Atticভাষা যে অতিমাত্র আথেন্সেরই গৃহস্থালীর স্বরের অনুরূপ হইয়াছিল, তাহাও ঠিক নয়। পূর্ব্বতন প্রধান তিনটি প্রাদেশিক ভাষা হইতেই প্লেটো তাঁহার ভাষার গড়ন পাইয়াছেন। বস্তুত আমরা মনে করি, ইহাই অধিকতর সত্য যে, সাহিত্যের ভাষার উপর বিশেষ কোন dialectএর যতই প্রভাব থাকুক না কেন, সব dialect হইতেই ন্যূনাধিক পরিমাণে সে উপকরণাদি সংগ্রহ করে, কোন একটি প্রদেশিকতা সে অনুসরণ করিয়া চলে না; যেখান হইতে যাহা লইবার যোগ্য, যাহা লইতে পারে, তাহা লইয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিকে আপন পথ করিয়াই সে চলিয়াছে। আর এইরূপেই সাহিত্যের ভাষা পুষ্ট, সমৃদ্ধ, একটা বিশিষ্টতায় মণ্ডিত হইয়া উঠে।

বঙ্গভাষা কোন বিশেষ dialectকে ধরিয়া গঠিত হয় নাই। রাঢ়-দেশের প্রভাব তাহার উপর যতই থাকুক না কেন, রাঢ়দেশের ভঙ্গিমা বা স্বরকেই সে একান্ত করিয়া লয় নাই। আর সেইজন্যই যে সে জড় মৃতবৎ হইয়াছে বা হইয়া উঠিবে, তাহা কিছু নয়। এ কথাটি মানিয়া লইতে আমরা ইতস্তত করিবই যে, সাহিত্যকে জীবন্ত রাখিতে হইলে মৌখিক ভাষায় অর্থাৎ কথাবার্ত্তায় যে শব্দ যে ভঙ্গিমা ব্যবহার করি না, বা করিতে পারি না, তাহা সব বিসর্জ্জন দিতে হইবে। সব দেশেই সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষা হইতে পৃথক—কথা শুধু এই যে কোথাও সে পার্থক্যের

পরিমাণ বেশী, কোথাও বা কম ; কিন্তু সেই অনুপাতে সাহিত্যের জীবনী-শক্তিও যে বেশী-কম হয়, তাহা বলা চলে না। বঙ্গভাষা পণ্ডিতগণের গড়া ভাষা, ইহা স্বীকার করিলেও আমরা দেখিতেছি, এ ভাষা বাঙ্গালীর সাহিত্যের প্রাণের ভাষাই হইয়া উঠিয়াছে—দৈনন্দিন জীবনকে হুবহু অনুকরণ না করিয়া চলিলেও তাহাতে জীবনেরই অভিব্যক্তি হইয়াছে ও হইতে পারে। সে জীবন একটু ভিন্নপ্রকার, এই যা পার্থক্য।

কিন্তু থিওরি হিসাবে সাধুপন্থী ও চলিতপন্থীদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে দেখিতেছি, সব প্রভেদ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনামগুলি ও আর দুই-চারিটি কথা লইয়া। সাধুপন্থীদের মধ্যে যেমন সংস্কৃত শব্দ, সংস্কৃত syntax অথবা ইংরাজি ভঙ্গিমা দেখা যায়, চলিতপন্থীদের মধ্যে যে তাহার নিতান্ত অভাব, এমন বলা যায় না। কলহ কেবল 'করিতেছি' 'হইয়া' 'ইহারা' 'নহে' লিখিব, না লিখিব 'কচ্ছি' 'হয়ে' 'এরা' 'নয়'। 'কচ্ছি' 'হয়ে' প্রভৃতি যদি সাহিত্যে স্থান পায়, তাহাতে আপত্তি নাও করিতে পারি। কিন্তু সেজন্য সাধু কথাগুলি যে অ-বাংলা বলিয়া নির্ব্বাসন করিতে হইবে, এমন প্রয়োজন দেখি না। মুখে আমরা 'করিতেছি' 'হইয়া' বলি না বটে, কিন্তু মুখে 'নূতন'ও বলা হয় না, 'চলিত'ও বলা হয় না—বলা হয় 'নতুন' 'চল্‌তি'। তবুও ত চলিতপন্থীদের লেখায় এ-সব 'অ-মৌখিক' শব্দ যথাতথা দেখিতে পাই। আর 'নূতন' বা 'চলিত' লিখিলে ভাষার যে জীবনহানি হয়, এমনও তাঁহারা স্বীকার করেন না। সুতরাং 'কারতেছি' 'ইহারা' লিখিলেই যে সব যজ্ঞ পণ্ড হইবে, এমন আশঙ্কা করিবার কিছু নাই। ছন্দের জন্য যদি কোথাও লিখিতে পারি 'নূতন', কোথাও লিখিতে পারি 'নতুন', তবে শুধু ছন্দ নয়—ভাবের অর্থের একটা বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই লিখিতে পারি 'করিতেছি' 'হইয়া' 'ইহারা' 'নহে'।

সে যাহাই হউক, বঙ্গভাষা ও বাংলাভাষার একটিকে মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করা ও অপরটিকে বিদেশী বলিয়া বিতাড়িত করা সমীচীন হইবে না। বাঙ্গলার হৃদয়ে এতখানি উদারতা বোধ হয় আছে—যাহাতে দুইটিই সেখানে স্থান পায়। অবশ্য, কোন ভঙ্গিমার সামর্থ্য কতখানি ও কোন্ দিকে, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার নিরসন তর্কে হইবে না। সে সমস্যা পূরণ হইবে সৃজনের দ্বারা, সাহিত্য-রচনার দ্বারা। চলিতপন্থীরা যে সত্যটুকু কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিতেছেন, তাহা যে আমরা দেখিতেছি না, তাহা নয়। সেটা হইতেছে আধুনিক যুগের ধর্ম্ম। বর্ত্তমান যুগের গতি হইতেছে বিশ্লেষণের দিকে, জিনিষকে কাটিয়া ভাঙ্গিয়া পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখান। সকল ভাষাতেও দেখি, এই বিশ্লেষণময়ী প্রকৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। সে চায় ভাবকে অর্থকে কথাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া, সরল সহজ মিহি করিয়া, বলয়িত ভঙ্গিমায় সাজাইয়া তোলা। বাঙ্গলার চলিত ভঙ্গিমা এই আদর্শটিকে কতখানি প্রতিফলিত করিতেছে বা করিতে পারে, সে প্রশ্ন আমরা করিব না। কিন্তু এই আদর্শ একটা পদ্ধতি মাত্র। ইহারই মধ্যে যে সাহিত্যিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ বা চরম পরিণতি, তাহা কে বলিতে পারে? আর বর্ত্তমান যুগেও আর কোন ভঙ্গিমার খেলা হইতে পারে না, এমন নিয়মই বা কে করিয়া দিতে পারে?

নারায়ণ : অগ্রহায়ণ, ১৩২৩ ও ভাদ্র, ১৩২৪

সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য

La nature est pleine de variétés et de moules divers : il y a une infinité de formes de talents. Critique, pourquoi n'avoir qu'un scul patron ?

—Sainte-Beuve

আর-সব জিনিষের ন্যায় সাহিত্যও তখনই সজীব সচল, তখনই প্রাণে প্রাণে ভরিয়া উঠে যখন সে বন্ধনহীন, যখন সে যদৃচ্ছভাবে খেলিতে পারে, যখন স্বাধীনতার মুক্তির প্রেরণা তাহার মধ্যে তরঙ্গায়িত দূরপ্রসারিত। আপনাকে যথা-অভিরুচি ছড়াইয়া দিয়া, যত দিক হইতে পারে জীবনের খাদ্য আহরণ করে, তাহাকে পুষ্ট সমৃদ্ধ মহনীয় করিয়া তোলে, নানা ভাবের নানা ভঙ্গিমার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রতিভাকে বিকশিত করিতে থাকে। জীবনের লক্ষণ বৈচিত্র্য, তাই জীবন্ত সাহিত্যেরও প্রকাশ বহুভঙ্গিম সৃষ্টির মধ্য দিয়া। কিন্তু যখনই আমাদের প্রধান চেষ্টা হয়, বিধিনিষেধের দ্বারা সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিতে, কোন বিশেষ ধারা বিশেষ রীতির মধ্যেই তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে, তখনই আমরা সাহিত্যের মরণসজ্জা প্রস্তুত করিতে থাকি। এ কথা সত্য, সাহিত্যে চাই অকৃত্রিম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহত্তম সৃষ্টি, আবর্জ্জনার বাহুল্য কাটিয়া ছাঁটিয়া একটা সত্যধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই তাহাকে গড়িয়া তোলা। সেজন্য প্রয়োজন এক প্রকার আদর্শ, স্বেচ্ছাচারের পরিবর্ত্তে একটা সংযম, গ্রহণ-বর্জ্জনের একটা নিয়ম। কিন্তু সেই আদর্শকে সূত্রনিবদ্ধ না করাই শ্রেয়। সৌন্দর্য্যের প্রতি, রসের প্রতি অকুণ্ঠিত অনুরাগ, উদার গুণগ্রাহিতা জাগাইয়া তোলা এবং প্রত্যেককে আপন আপন অন্তরের কবি-অনুভূতির

পথে মুক্তভাবে চলিতে দেওয়া, জীবন্ত স্থায়ী সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে ইহাই আবশ্যক। সাহিত্যের ধর্ম্মকে যখন সঙ্কুচিত করিয়া ফেলি, আদর্শের মধ্যে যখন এইরূপ এক উদার প্রসার পাই না, মানব-আত্মাকে কবি-প্রতিভাকে আপন বিসারের জন্য বহু ও বিচিত্র প্রণালী কাটিয়া লইতে দিই না, মহিষ্ঠ গরিষ্ঠ সত্যধর্ম্মসম্বিত করিতে যাইয়া সাহিত্যকে যদি কোন অদ্বৈত ভাবের মধ্যে ধরিয়া লইতে চাই, তবে দুই-একজন অমানুষী প্রতিভার মধ্যে সে কৈবল্যমুক্তির আবির্ভাব দেখিলেও দেখিতে পারি, কিন্তু নীচে সাধারণের মধ্যে সাহিত্যের জীবনমূলটি শুকাইয়া উঠিতেই দেখিব।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভিক্তর হিউগো যখন ফরাসী সাহিত্যে ভাবের ভঙ্গিমার বিপ্লব ঘটাইতেছিলেন, পুরাতনের সঙ্কীর্ণ আভিজাত্যটি ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতার স্বাতন্ত্র্যের মুক্ত জীবনের স্রোত বহাইতে চাহিতেছিলেন, তখন পুরাতনের দল তারস্বরে বলিতেছিলেন, হিউগোর ভাষা ফরাসী ভাষা নয়, তাঁহার কবিতায় ফরাসী কবিতার প্রাণধর্ম্ম নাই, তিনি ক্লাসিক নহেন। ইঁহাদের মুখপাত্র হইয়া ফরাসী কবি-প্রতিভার তথাকথিত কোটটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দাঁড়ান নিসার (Nisard)। এই নিসারকে লক্ষ্য করিয়া উদারদৃষ্টি সমালোচক সেন্তব্যভ্ বলিতেছেন, "প্রকৃতি বৈচিত্র্যে ভরা, সেখানে কত রকমারী ছাঁচ। প্রতিভারও অনন্ত রূপ। তবে, সমালোচক, তুমি কেন একটিমাত্র আদর্শই ধরিয়া থাকিবে?"

বাস্তবিক পক্ষে ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দেয়, সাহিত্য যেখানে উদার প্রতিষ্ঠা পায় নাই, যেখানেই সাহিত্যসৃষ্টির একটা বিশেষ মানদণ্ড খণ্ডিত আদর্শ স্থাপন করিয়াছি, একটি কৌলীন্য গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছি, সেখানে তদনুযায়ী এক মহনীয় মহম্মন্য সৃষ্টি করিতে পারিলেও, তাহারই মধ্যে আবার পতনের বীজ বপন করিয়াছি। ইংলণ্ডে মিল্‌তন, ফরাসীতে

কর্ণেই রাসীন, লাতিনে ভর্জ্জিল হোরাস এইরূপ অভিজাত্যাভিমানী কবি, এবং ইঁহাদের সহিত আমাদের কালিদাস ভবভূতিরও নাম করা যাইতে পারে। ইঁহারা সকলেই ছিলেন রাজপরিষদের গুণিজনের কবি—বিদ্যাবান্ মার্জ্জিতবুদ্ধি, পরিশুদ্ধরুচি, শোভনকর্ম্মী শিল্পী। যাহা গড়িয়াছেন তাহাকে ঘষিয়া মাজিয়া, সুন্দর করিয়া, ঐশ্বর্য্যে ভরিয়া তবে গড়িয়াছেন। তাঁহারা রচিয়াছেন রাজজনোচিত হর্ম্ম্যাবলি, মর্ম্মরে বিন্যস্ত, মণিমাণিক্য-খচিত— সাধারণের সেখানে যেন সসম্ভ্রমেই পদার্পণ করিতে হয়। ইঁহারা প্রথম পথপ্রদর্শক; যে আদর্শ ইঁহারা স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের প্রাণের অন্তরাত্মার বস্তু। তাঁহারা ছিলেন প্রতিভাবান, তাই তাঁহাদের সৃষ্টি অনবদ্যাঙ্গ, জীবন্ত, মহনীয়—সকলের পূজার্হ। কিন্তু পরে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তিগণের আদর্শটি সম্মুখে রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু অন্তরে সেই একই জ্বলন্ত অনুভূতি রাখিতে পারেন নাই, তাঁহাদের নিকট সে আদর্শ হইয়া পড়িয়াছে শাস্ত্রবিধান—কষ্টকল্পনা মাত্র। সাহিত্যের ধারাটি—শিষ্টাচারটি অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া হারাইয়াছেন স্বাতন্ত্র্য, নিজের প্রাণের উপলব্ধি—হারাইয়াছেন সাহিত্য-সৃজনের মূল মন্ত্রটি। তাই দেখি, মিল্‌তনের পরেই পোপ, কর্ণেই'র পরেই বোয়ালো, ভর্জ্জিলের পরেই ওভিদ স্টাস, কালিদাসের পরেই ভট্টি বাণভট্ট।

লাতিন ও গ্রীক সাহিত্যের তুলনা এই প্রসঙ্গে খুবই শিক্ষাপ্রদ। গ্রীকের সৌন্দর্য্যবোধ—রসবোধ ছিল উদার-বিস্তৃত। তাহাদের দৃষ্টির মধ্যে ছিল একটা ব্যাপকতা, নমনীয়তা—উহা চলিত সুবলয়িত তরঙ্গ-ভঙ্গে। তাহাদের কবিত্বপ্রতিভায় ছিল মুক্তির দূরপ্রসারিত অবকাশ, স্বচ্ছন্দগতির বিচিত্র ভঙ্গিমা। অন্যপক্ষে বীরকর্ম্মী বস্তুতান্ত্রিক লাতিন জাতির মধ্যে ভাবুকতার, কল্পনাপ্রিয়তার সে লীলায়িত রেখাপাতের নৈপুণ্য ছিল না। তাহারা জিনিষকে দেখিত ঋজু দৃষ্টিতে, জিনিষকে

ধরিতে চাহিত জিনিষের যে স্পষ্ট স্ফুট সহজগ্রাহ্য অঙ্গ, তাহার সহায়ে। কাটিয়া ছাঁটিয়া, ঘষিয়া মাজিয়া সব পদার্থকে একই ছাঁচে গড়িতে তাহাদের আনন্দ। বিজয়ী জাতি তাহারা—বহু জাতি, বহু দেশ, বহু ধর্ম্মকে পিষিয়া এক মহাজাতি, মহাদেশ, মহাধর্ম্মে পরিণত করিতে চাহিয়াছিল, সব অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিল এক নামে—রোম। সাহিত্যেও তেমনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল একটা আদর্শ—বীরের গম্ভীর আরাব, বিজয়ীর দৃপ্ত তেজস্ ওজস্, সেনানীর মুখে সে আদেশ-বাণীর অক্ষরকার্পণ্য, রাজানুশাসনের কঠোর স্পষ্টতা, বাগ্মিতার ধীরপ্রসারিত পূর্ণতা। প্রাকৃতজনের (plebs) হাব-ভাবে কথায়-চিন্তায় যে সহজবিগলিত গড্ডালিকাপ্রবাহ, যে সদাচঞ্চল উচ্ছৃঙ্খল গতি, তাহাকে রোম অবহেলার চক্ষেই দেখিয়াছে। সে চাহিয়াছে আভিজাত্যের (Patricii) গুরুভার গাম্ভীর্য্য। আর রোমনগরী যে আদেশ প্রচার করিয়াছে, যে আদর্শ দেখাইয়াছে, সমস্ত রোমসাম্রাজ্য তাহাকে অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে—তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া কেহই রোমক নামের অমর্য্যাদা দেখাইতে সাহস পায় নাই। সাহিত্য হউক অথবা রাজনীতি সমাজনীতি যাহাই হউক, সকল ক্ষেত্রে একমাত্র গুরু রোমনগরী। গ্রীক কিন্তু তাহার প্রতিভাকে এইরূপ একই কেন্দ্রে সম্পুটিত করিয়া রাখে নাই। রোমনগরীর ন্যায় এথেন্স গ্রীক-সভ্যতার তেমন সর্ব্বগ্রাসী কেন্দ্র হইয়া পড়ে নাই—যতটুকু হয়, তাহা বহু পরে; গ্রীসের প্রত্যেক প্রদেশই একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা জাগ্রত বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ভাষাকে একই প্রকরণে ঢালে নাই, ভাবকেও কোন একটি ধারায় আবদ্ধ রাখে নাই। প্রত্যেকেরই আপন আপন প্রেরণা ও ভঙ্গিমার স্বতঃস্ফুরণে এমন বিচিত্র মহনীয় গ্রীক-সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। এই স্বাধীনতা, এই যদৃচ্ছ অঙ্গসঞ্চালনের অভাবে লাতিন-সাহিত্য অল্প দিনেই পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রকৃত প্রতিভা দেখাইয়াছে

দুই-একটি বিষয়ে মাত্র। গ্রীক কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত দিকে, কত বিষয়ে, সাহিত্যের কত প্রকরণে আপনাকে বিকশিত করিয়া দিয়াছে।

সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতা-দোষও যেমন আছে, শুচিদোষও ঠিক তেমনি আছে। সাহিত্যকে যাঁহারা রমণীয়, মহনীয়, পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে এক দলের এই শুচিব্যাধি খেলিয়াছে রূপ বা গঠনটি লইয়া। নামে তাঁহাদের লক্ষ্য classic manner, বস্তুত কিন্তু তাঁহারা জড়াইয়া পড়েন আভিজাত্যের ঠাটটি লইয়া। সাহিত্যে আভিজাত্য চাই, কিন্তু প্রধানত তাহা অন্তরাত্মার আভিজাত্য। Classic soul যাঁহার, classic manner তাঁহারই সহজসিদ্ধি। মহিষ্ঠ গরিষ্ঠ বলিয়া বিশেষ কোন একটি ধারা নাই। কাব্যের আত্মপরিস্ফুরণ, বিশ্বকবির কবিত্বশক্তি বহুরূপী। তাহাকে দুই-একজন কবির বা দুই-একটি কবি-সঙ্ঘের ভঙ্গিমায় আবদ্ধ রাখা চলে না। বিষ্ণুর মত কবিত্বপ্রতিভাও—অনবধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা। আমাদের শাস্ত্রে ছত্রচামরাদি কয়েকটি বস্তু রাজার চিহ্নস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; সাহিত্যরাজকেও যে সেইরূপ কোন বিশেষ পরিচ্ছদ বা চিহ্নে মণ্ডিত করিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। যখন বলি মহাকাব্যে এতগুলি সর্গ থাকিবে, নাটকে এতগুলি অঙ্ক থাকিবে, নায়কের এই এই গুণ থাকিবে, এই এই উপমা দিতে পারিবে, আরগুলি পারিবে না অথবা আখ্যায়িকার আখ্যানবস্তুটির প্রথম হইতেই আরম্ভ করিবে, মাঝখান হইতে (in medias res) পারিবে না, তখন যে কিরূপ সাহিত্যসৃষ্টি হয়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সাহিত্যে আর-এক শুচিব্যাধি আছে—ঐটি আধুনিক যুগেই দেখা দিয়াছে, তাহা হইতেছে সাহিত্যের উপর 'নীতিকতা', ধার্ম্মিকতা, শ্লীলতার দাবী। সাহিত্যের মুক্ত বিকাশ যদি চাই, তবে এ বন্ধনটিও কাটিতে হইবে। জীবন্ত কি মৃত, কোন ভাষাতেই এ উদাহরণ পাই

না যে, শ্লীলতা, সাধুতা, এমন কি আধ্যাত্মিকতার পদতলে সাহিত্য আপনাকে নিগড়িত করিয়াছে। ফরাসীর কথা ছাড়িয়াই দিলাম, লাতিন-সাহিত্য—যাহার আদর্শে এতখানি শোভনতা, বাহ্যশীলতা, গুরুগম্ভীরতার স্থান, সেখানেও উদ্ভূত হইয়াছেন কাতুল্ল (Catullus) ওভিদ। আর সংস্কৃত লৌকিক সাহিত্যের ত কথাই নাই, বৈদিক ঋষিদিগের আধ্যাত্মিকতা ব্যাখ্যানের মধ্যেও এমন কথা পাই আধুনিকগণ যাহাকে অকথ্য অশ্রাব্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিবেন।

সাহিত্যের আত্মার স্বাধীন উন্মুক্ত গতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ শেক্সপীয়র। শেক্সপীয়র, আলঙ্কারিক হউক আর নৈতিক হউক, কোন শৃঙ্খলেই আপনার প্রতিভাকে বাঁধিয়া রাখেন নাই। ক্লাসিকের আত্মস্থ গাম্ভীর্য্য, রোমাণ্টিকের উচ্ছ্বসিত প্রগল্‌ভতা, জ্ঞানীগুণিজনসুলভ মার্জ্জিত বাক্য-বিন্যাস ও ধীর চিন্তাশীলতা, প্রাকৃতজনের দোলাচলচিত্তবৃত্তি ও তদনুরূপ কথাভঙ্গি—সকলের মধ্য দিয়া তাঁহার সৃষ্টি সকল রসের আধার এক বিরাট মহাসাগর তুল্য। শেক্সপীয়রের কবিপ্রেরণা প্রকৃতির মতনই অবাধে অজস্রগতিতে আপনাকে ছুটাইয়া দিয়াছে, তাই তাহাতে এত বৈচিত্র্য, তাই তাহা এত জীবন্ত। পিউরিটান কবি মিল্‌তনের উপরেও তাই শেক্সপীয়রের স্থান। শেক্সপীয়রের ন্যায় মোলিয়েরও কোন বিশেষ মতবাদ বা সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে আপনাকে ধরা দেন নাই। তাঁহার প্রতিভায় রুচির উদারপ্রসার লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। রাসীনের যে পরিপাটী আভিজাত্য, কর্ণেই'র যে গর্ব্বোন্নত মহীয়ত্ব, সেখানে পাই কেমন একটা সঙ্কীর্ণতা। সেইজন্যই মোলিয়েরকে তাঁহাদেরও উপরে স্থান দিতে ইচ্ছা হয়।

কাব্যসৃষ্টির মূলকথা এইখানে, আখ্যানবস্তুর যে মূল্য থাকুক না, ভঙ্গিমার যে মর্য্যাদা থাকুক না, সকলের উপরে হইতেছে কবির সে নিগূঢ় অনির্ব্বচনীয় শক্তি—আত্মার তপঃ-অভিব্যঞ্জনা। এই মূল শক্তিটির

আধার যে কবি, তিনি সহজেই তাঁহার সকল ভাব, সকল ভঙ্গিমাই এক নৈসর্গিক আভিজাত্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। ফলত, আমরা মনে করি, কবিত্বের এই মৌলিক উৎসটি হইতে যখন আমরা দূরে চলিয়া যাইতেছি, যখন আত্মার সে স্বাধীন বিহার-প্রাঙ্গণ সঙ্কুচিত হইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে, তখনই কবিত্বের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিশেষ আদর্শ, বিধিনিষেধ স্থাপন করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি, তখনই কবিত্বশক্তির একটা বিশেষ প্রকরণ স্থিরনির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। উদারতা প্রসারতা যখন হারাইতে বসিয়াছি, তখন একটি বিশেষ অঙ্গকেই অতিকায় করিয়া তুলিয়াছি। সাগরের অনন্ত বিস্তারের পরিবর্ত্তে চাহিয়াছি শৈলশিখরের উত্তুঙ্গ স্থৈর্য্য, মর্ম্মরের দৃপ্ত শোভনীয়তা। সেইজন্যই বোধ হয় সফোক্লা হইতেও হোমর গরীয়ান্, কালিদাস হইতেও বাল্মীকি গরীয়ান্। কিন্তু ব্যক্তিগত হিসাবে যাহাই হউক না, সমগ্র একটি জাতির সাহিত্য যদি এইরূপ একমুখী এক আদর্শানুযায়ী হয়, তবে সে সাহিত্য শুকাইয়া উঠিবে। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও শেষ দিক দিয়া ইহাই ঘটিয়াছে। যে দিন মানুষের আগে বসাইয়াছি শিল্পীকে, যে দিন কেবল অভিরূপভূয়িষ্ঠ পরিষদের জন্যই কাব্য সৃষ্টি করিয়াছি, সেই দিন হইতেই সংস্কৃত সাহিত্য ক্রমে ক্রমে লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, অবশেষে পাণ্ডিত্যের তর্কবুদ্ধির শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছে।

যথার্থ কাব্য, মহনীয় সাহিত্য, প্রকৃত আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে কোন বিশেষ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া নয়, কালিদাস বাল্মীকি বা বৈদিক-কবির পন্থাটি দেখাইয়া নয়, কিন্তু সমগ্র জাতির নিগূঢ় সারস্বত-প্রতিভাকে জাগাইয়া তুলিয়া। প্রাচীন গ্রীসে আপামর এইরূপ গুণী ছিল, সকলেই মার্জ্জিত রুচি উচ্চ ভাবের ভাবুক, সমস্ত জাতিটি দেশটিই ছিল বাণী দেবীর জীবন্ত বিগ্রহ। সফোক্লার নাটক দেখিতে দলে দলে লোক—সাধারণ

লোক সব—এথেন্সের রঙ্গালয়ে ছুটিত। বর্ত্তমান যুগে সুলভ অপেরা দেখিতে আবালবৃদ্ধবনিতার যেমন আগ্রহ উৎসাহ পরিতুষ্টি, আন্তিগোণা দেখিয়া গ্রীসের জনসঙ্ঘ তেমনই উদ্বেলিত হইয়া উঠিত, তদপেক্ষা গভীর ভাবেই নাট্যরসের আনন্দ উপভোগ করিত। গ্রীসের Intelligentsia —গুণিসমাজ ছিল সমস্ত গ্রীকজাতি। গ্রীসের বহুবলয়িত সাহিত্য-প্রতিভার ইহাই মূল। প্রকৃত সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইলে, তাহার বিচিত্র বিপুল বিকাশ দেখিতে হইলে—রাজনীতিতে যেমন Peuple Roi, সাহিত্যেও তেমনি গড়িয়া তুলিতে হইবে Peuple Intelligentsia. ইউরোপে রেনাসেন্সের যুগে, আবার রোমান্টিকের যুগে এইরূপ একটা বিপুল Intelligentsiaর উদ্ভব হইয়াছিল—ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি এই দুই স্রোতের মুখে।

নারায়ণ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪